স্টিফান জাইগ

অনুবাদ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ টি. কে. ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোং ॥

৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

প্রকাশক
তমস বন্দ্যোপাধ্যায়
টি. কে. ব্যানার্জি এ্যাণ্ড কোং
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
মণীন্দ্র মিত্র

দুই টাকা

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
বন্ধুবরেষু

॥ অনুবাদকের অন্যান্য বই ॥

। গল্প ।

নতুন নায়িকা

রাম রহিম

রাত্রির আকাশে সূর্য

। প্রবন্ধ ।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

। অনুবাদ ।

দুই ভাই : মোপাসাঁ

প্রিয়তমেষু : জাইগ

অন্তর্জ্বালা :

গোধূলির গান :

শাদা কালো : কল্ডওয়েল

ইত্যাদি ।

নিউইয়র্ক থেকে বুয়েনস-আয়ার্সগামী জাহাজটি ছাড়বে মাঝরাত্তিরে, শেষমুহূর্তের কর্মতৎপরতায় চারদিক এখন মুখর। বন্ধুদের বিদায় দিতে এসে লোকজন ভিড় জমিয়েছে ইতস্তত। বয়-বেয়ারারা যাত্রীদের নাম ডেকে ডেকে ছুটোছুটি করছে, উঁকিঝুঁকি মারছে এঘরে-ওঘরে। সশব্দে মালপত্র তোলা হচ্ছে। ফুলের তোড়ার বিনিময় চলছে। কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা হুটোপুটি লাগিয়েছে দঙ্গল বেঁধে।

আর, সেই সঙ্গে একটানা বেজে চলেছে ডেকের অর্কেস্ট্রা।

এই হইচই থেকে গা বাঁচিয়ে ডেকের একপাশে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। হঠাৎ আমাদের কাছাকাছি দুতিনবার ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঝলসে উঠল। সন্দেহ-কি, কোন মান্যগণ্য ব্যক্তির ফটো নিচ্ছে প্রেস-ফটোগ্রাফাররা। শেষবারের মত ইণ্টারভিউয়ের জন্যে তাঁকে হয়ত ছেঁকে ধরেছে।

বন্ধু সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, তোমার সাথে এক আজব চিড়িয়া এই জাহাজেই চলেছে, বুঝলে ?—ঝেণ্টোভিক।

ঝেণ্টোভিক ! বন্ধুর কথা শুনে, বোধ হয়, আমার চোখে-মুখে অপরিসীম অজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। কেননা বন্ধুবর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বললেন, ঝেণ্টোভিক হে, মির্কো ঝেণ্টোভিক—দাবাখেলায় যে ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ন,

মানে পৃথিবীর সেরা দাবাড়ে—চেননা? আমেরিকা জয় সাঙ্গ করে ও এখন আর্জেন্টিনা অভিযাত্রী, পথে প্রত্যেকটি দেশে খেলা দেখাবে।

এবার মনে পড়ল আমার। এই তরুণ চ্যাম্পিয়নের নামটাই শুধু নয়, হাউয়ের মত ওর হঠাৎ-খ্যাতির কিছু-কিছু কাহিনীও। বন্ধু অবিশ্যি আমার চেয়ে অনেক-বেশি ওকীবহাল। খবর-কাগজের নিয়মিত পাঠক হিসেবে ওর জীবনের বহু খুঁটিনাটি উনি জানেন দেখলাম।

কথায় কথায় বন্ধু বলে চললেন ওর বিচিত্র জীবন-ইতিহাস—

বছরখানেক আগে রাতারাতি ঝেণ্টোভিক পৃথিবীর সেরা দাবাড়ে এ্যালেকাইন, ক্যাপাব্ল্যাঙ্কা, তার্তাকোভার, ল্যাস্কের, বগুলযোবভ প্রমুখের পর্যায়ে উঠে যায়। ১৯২২ সালে নিউইয়র্কে ন বছরের বিস্ময়বালক রেশেভস্কির আবির্ভাব যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, ঝেণ্টোভিকের মধ্যে দিয়ে ঘটল তার প্রথম পুনরাবৃত্তি। রেশেভস্কির পরে আর-কোন আগন্তুক দেশব্যাপী এমন আলোড়ন জাগাতে পারেনি। তবে আশ্চর্য কি জানো, মানসিক উৎকর্ষের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ঝেণ্টোভিকের মধ্যে প্রথমে কেউ প্রতিভার নামমাত্র লক্ষণও ছাখেনি, ভাবতেও পারেনি ভবিষ্যতে ও একটা কেউকেটা হয়ে উঠবে। দুদিনেই সবাই জেনে গিয়েছিল যে, দাবার আসরে চ্যাম্পিয়ন হলে কি হবে, বানান ভুল না করে কোন ভাষায় একটি লাইনও

লিখতে ও পারেনা। ওরই এক সহধর্মী বন্ধু সেদিন বিদ্রূপ করে বলেছিল: কৃষ্টির কোন বালাই ওর নেই। এক দাবা ছাড়া আর-সবেতেই উনি মহাপণ্ডিত!

ঝেণ্টোভিকের বাবা ছিল যুগোশ্লাভিয়ার দীনদরিদ্র এক মাঝি। দানিউবে নৌকো বেয়ে কোনমতে সে সংসার চালাত। একদিন রাত্তিরবেলা শস্যবাহী এক জাহাজের ধাক্কায় নৌকোটি তার ডুবে গেল, সেই সঙ্গে তারও ঘটল সলিলসমাধি। ঝেণ্টোভিকের বয়েস তখন তেরো। বাপ ডুবে মরল জলে, ও পড়ল অকূল পাথারে। সংসারে আপন বলতে আর কেউ নেই। দয়াপরবশ হয়ে গাঁয়ের পাদ্রীসাহেব ওর ভার নিলেন। ভার নিয়ে ওকে মানুষ করে তোলবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। মগজে পদার্থ বলতে কিছু নেই, ভালো করে কথা কইতেও পারে না, চোরের মত সবসময় ভয়ে ভয়ে পিটপিটিয়ে তাকায়—এ ছেলেকে ইশকুলে দেওয়া বৃথা। বাড়িতেই তিনি মির্কোকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করলেন।

কিন্তু সব চেষ্টা তাঁর বিফল হল। চোখে আঙুল দিয়ে হাজার বার বুঝিয়ে দিলেও মির্কো এমন ফ্যালফ্যাল করে বর্ণপরিচয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন অক্ষরগুলো তার কাছে অদৃষ্টপূর্ব অশ্রুতপূর্ব কতকগুলো আঁকিবুকি মাত্র। মাথা তো নয়, গোবরের গুদোম। অতিসাধারণ বিষয় বোঝবারও ক্ষমতাটুকু নেই তার। চোদ্দ বছর বয়েসেও সে কর গুণে গুণে এক দুই শেখে। কোন বই বা খবরের কাগজ থেকে দুছত্র পড়তে গেলে কালঘাম ছুটে যায় বেচারার।

তাই বলে মির্কো অবাধ্য বা কুঁড়ে' একথা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না। যে কাজেরই ভার তাকে দাও, মুখ বুজে তা হাসিল করবে। জল তোলা, কাঠ চেরা, রান্নাঘর ধোওয়া বা ক্ষেত-খামারের তদারকি—সবেতেই সে পারঙ্গম। নিশ্চিন্তে তার ওপর এসব কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায়। অবিশ্যি এক ঘণ্টার কাজে তার ঘণ্টাতিনেক লাগবে, তবে কাজ সে করবে নির্ঘাৎ। শুধু লেখাপড়া ছাড়া আর-কোন ব্যাপারে ও পিছপাও নয়।

পাদ্রীসাহেবের আপসোস তবু ঘোচেনা। ছেলেটা কাজকর্ম সব করে বটে, কিন্তু, যন্ত্রের মত। নিজে থেকে তার কোন ব্যাপারে কোনরকম উৎসাহ নেই। কেমন-যেন নির্জীব, নিষ্প্রাণ। মুখ ফুটে না বললে নড়ে বসে না, মুখ ফুটে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। খেলাধুলো করা দূরে থাক, পাড়ার ছেলেছোকরাদের সঙ্গে মেশেনা পর্যন্ত।

ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম সারা হলে চুপচাপ কোথাও বসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে। আশপাশের কোন ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই, তাকিয়ে তাকিয়ে সে যেন অদৃশ্য গরুবাছুরের তৃণাহার দর্শন করছে—এমনি তার ধরনধারন।

ওদিকে পাদ্রীসাহেবের ছিল ভয়ানক দাবার বাতিক। রোজ সন্ধ্যেবেলা তিনি তামাকের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে গাঁয়ের পুলিশ-সার্জেন্টের সঙ্গে খেলতে বসতেন। খেলতেন গোণাগাঁথা তিন বাজি। এ একেবারে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। জড়ভরত ছেলেটা তখন গুটিগুটি পাশে এসে বসে, নিরাসক্ত নিস্পৃহ

ছুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে দাবার ছকের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমোয় বোধ হয়।

সেদিন এক শীতের সন্ধ্যা। দৈনন্দিন খেলায় দুজনে মশগুল, দূরে গাড়ির ঘড়ঘড় শোনা গেল। খানিক পরেই এক চাষা এসে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মাথার টুপিটা তার বরফে শাদা হয়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল মার তার যায়-যায় অবস্থা, শেষ-কৃত্যের জন্যে পাদ্রীসাহেবকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

একথা শোনামাত্র পাদ্রীসাহেব খেলা ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। চলে গেলেন তার সঙ্গে।

এদিকে সার্জেণ্ট মশায়ের বীয়রের পাত্রঃ তখনো শেষ হয়নি। তবু সে-ও প্রস্তুত হল যাবার জন্যে। থেকে আর কী লাভ! পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ভেড়ার চামড়ার পেল্লায় বুটজোড়ার দিকে হাত বাড়িয়েছে, ছাখে-কি, ছকের ওপর ছড়ানো ঘুঁটিগুলির দিকে তাকিয়ে চনমন করছে মির্কোর ছুই চোখ।

কিরে ছোঁড়া, বাজিটা শেষ করবি নাকি? ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল সার্জেণ্ট। কেননা মির্কোর দৌড় জানতে তো বাকি নেই তার। বাজি শেষ করবে কি, ওই হাবা-গঙ্গারাম ঘুঁটি চিনলে তো!

সলজ্জ হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল মির্কো। তারপর এসে বসল পাদ্রীসাহেবের শূন্য আসনে। শুরু হল খেলা।

এবং, চোদ্দ চালের পর হেরে গেল সার্জেণ্ট!

হঠাৎ-আচমকা হারা নয়, সার্জেন্টকেও মনে মনে স্বীকার করতে হল, এপরাজয় তার একান্তই অনিবার্য।

নতুন করে খেলা শুরু হল।

আবার হারল সার্জেন্ট!

ফিরে এসে পাদ্রীসাহেব একথা শুনে তো তাজ্জব। এ কি অঘটন! হাজার দুয়েক বছর আগে এই রকম একটা ব্যাপার অবিশ্যি ঘটেছিল, চোখের পলকে জনৈক মূক পরিণত হয়েছিল জ্ঞানী বাগ্মীতে।

কিন্তু বাইবেল সম্পর্কে সার্জেন্ট মশায়ের জ্ঞান তেমন গভীর নয়, সে শুধু মুখে হুঁ-হাঁ দিয়ে গেল। তাজ্জব সে-ও বড় কম হয়নি।

পাদ্রীসাহেব আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। অত্যুৎসাহে নিজের হাবাগোবা চাকবটাকেই তিনি চ্যালেঞ্জ করে বসলেন।

তাঁকেও মির্কো হারিয়ে দিল অবলীলায়। ধীরে ধীরে সে খেলতে লাগল, চাল দিতে লাগল অনেক ভেবেচিন্তে, বারেকের জন্যেও ছক থেকে মাথা তুলল না। জয় যেন তার হাতের পাঁচ—ভাবখানা এই রকম—তাকে হারায় সাধ্যি কার!

সত্যি, কেউ আর হারাতে তাকে পারল না। এরপর যে কদিন খেলা হল, পাদ্রীসাহেব এবং সার্জেন্ট দুজনেই বারবার হেরে গেল তার কাছে।

মির্কোর সর্ববিধ অকর্মণ্যতা সম্পর্কে পাদ্রীসাহেবের বিন্দুমাত্র

সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু এবার তার মধ্যে এই অত্যাশ্চর্য নতুন একটি গুণপনার হদিশ পেয়ে তাঁর কৌতূহলের আর অবধি রইল না।

গাঁয়ের নাপিতকে ডাকিয়ে প্রথমে তিনি মির্কোকে খানিকটা ভদ্রস্থ করে নিলেন, তারপর তাকে নিয়ে চললেন শহরে। শহরে অনেক বড় বড় দাবাড়ে রয়েছে, মেইন স্কোয়ারের পাশের কফিখানায় হরবখত তারা আড্ডা মারে। ওখানেই মির্কো-প্রতিভার সম্যক যাচাই হবে।

পাদ্রীসাহেব কফিখানায় ঢুকলেন, তার পিছনে পিছনে শনের মত চুল টুকটুকে গাল বছর পনেরোর এক কিশোর। দুজনের দিকে তাকিয়ে আড্ডায় উঠল চাপা হাসির ঢেউ। গায়ে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট, পায়ে ইয়া বড় বড় দুই বুট, লজ্জায় আনত চোখমুখ—দাবার টেবিলে না ডাকা পর্যন্ত ঠায় এই ভাবে মির্কো দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

প্রথমবার হেরে গেল মির্কো। কারণ, সিসিলীয় আত্মরক্ষা-পদ্ধতির নিয়মকানুন সে জানত না। তস্য কারণ, পাদ্রীসাহেব বনাম সার্জেন্টের খেলায় ওই পদ্ধতির প্রয়োগ সে কোনদিন ছাখেনি। যাই হোক, দ্বিতীয়বার সে খেলল আড্ডার সেরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে। আর এই খেলা শেষ হল ড্র-তে। দুপক্ষই সমান সমান।

কিন্তু তৃতীয়বার, চতুর্থবার, এবং তারপর প্রত্যেকবার জিতল মির্কো। একে একে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে কাৎ করল সে।

এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রীতিমত চাঞ্চল্যকর। বিশেষত, যুগোশ্লাভিয়ার এই শহরটির পক্ষে। ছোটখাট শহরে চাঞ্চল্যকর ঘটনা তো বড় একটা ঘটেনা, তাই শহরময় এ নিয়ে মহা আলোড়ন পড়ে গেল। পড়বে না, শহরের হুঁদে হুঁদে দাবাড়েদের হারিয়ে দিল কোন্-এক অখ্যাত-অজ্ঞাত কিশোর চাষী? চাষী নয়, চাষা!

সবাই মিলেমিশে ঠিক করল, ছেলেটিকে আজ ছেড়ে দেওয়া হবে না, রববার দাবাসঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে, ডাকা হবে দাবাপাগল কাউন্ট সিম্‌ক্‌ঝিকের সাহায্য-রজনী হিসেবে। তাতে খেল৷ দেখাবে এই কিশোর-প্রতিভা।

নিজের বশংবদ ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে পাদ্রীসাহেবের বুক আনন্দে গর্বে ফুলে উঠল। কিন্তু তাঁর থাকবার যো নেই। রববারের প্রার্থনা-সভায় যোগ তাঁকে দিতেই হবে। কর্তব্যের তাগিদ সবচেয়ে বড়। অতএব, মির্কোকে রেখে তিনি গাঁয়ে ফিরে গেলেন। দাবাসঙ্ঘের লোকেরা ঝেণ্টোভিককে নিয়ে তুলল স্থানীয় এক হোটেলে।

আর ঝেণ্টোভিক? তার অবস্থা, যাকে বলে, অবর্ণনীয়। এতদিন শুধু কলের পায়খানার নামই শুনেছে, জীবনে এই প্রথম বস্তুটা চোখে দেখল। এমনি আরো কত-কি!

এল রববারের বিকেল। দাবা-ঘরটি লোকে গিশগিশ।

মির্কো ঝাড়া চার ঘণ্টা ছকের দিকে অপলক, মুখে রা নেই, একেবারে নট নড়নচড়ন। এক-একজন তার সামনে এসে বসে, খানিক পরেই উঠে যায় মাথা হেঁট করে। সব্‌বাই হেরে ভূত।

অবশেষে প্রস্তাব হল, জোট খেলার। অর্থাৎ, মির্কো একা এবং একসঙ্গে সকলের সাথে খেলবে।

ব্যাপারটা মির্কো প্রথমে ঠাওর করে উঠতে পারেনি. সবাই মিলে তাকে তখন বুঝিয়ে দিল।

তাতেও মির্কো গররাজি না। দেখতে দেখতে ব্যাপারটা সে ধাতস্থ করে নিল। টুকটুক করে এক-একজনের টেবিলেব সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ধীরেসুস্থে চাল দেয়, তারপর চলে যায় পরেব টেবিলে। শেষপর্যন্ত দেখা গেল, আটটা খেলার মধ্যে সাতটাতেই জয় হয়েছে তার।

এবার শুরু হয়ে গেল সলাপরামর্শ। যারপরনাই ভাবিত সবাই। নতুন চ্যাম্পিয়নটি অবিশ্যি এই শহরের লোক নয়, না হোক, এক দেশের লোক তো বটে ? ও এখন দেশের গৌরব, জাতির গর্ব। মির্কোকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে উঠল শহরবাসীদের জাতীয়তাবোধ। অতিসাধারণ এই শহর, বাইরের লোকে নামটা পর্যন্ত জানেনা। কিন্তু আজ এসেছে সুবর্ণ সুযোগ। এক অতিমানুষের আবির্ভাব হয়েছে আজ এই শহরে। এ বিশ্বজয় করতে পারে, বিশ্বের মানচিত্রে উজ্জ্বলতম অক্ষরে খোদাই করে দিতে পারে এই শহরের নাম।

কোলার এই শহরেরই বাসিন্দা। স্থানীয় নৃত্যশালায় নাচিয়ে-গাইয়ে সরবরাহ করা তার পেশা। নিজে থেকে সে এগিয়ে এল। বলল, ভিয়েনী এক দাবা-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তার বিশেষ জানাশোনা রয়েছে। তিনি যাতে মির্কোকে আরও-কিছুটা তালিম দেন তার ব্যবস্থা সে করে দেবে। এখনো

ওর খেলায় যৎসামান্য গলদ-গাফিলতি দেখা যায়, তাঁর তালিম পেলে বছরখানেকের মধ্যে ওটা একেবারে শুধরে যাবে।

দাবাপাগল বলতে যা বোঝায়, কাউণ্ট সিম্‌ক্‌ঝিক হলেন তাই। ষাট বছর ধরে নিত্য-নিয়মিত তিনি দাবা খেলে আসছেন, কিন্তু এমন দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ কোনদিন পাননি। তিনিও যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এই ভাবে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল দানিউবের মাঝির ছেলের জীবনে। জীবনে তার যুগান্ত ঘটল।

মাত্র ছ মাসের মধ্যে মির্কো দাবা খেলার সমস্তরকম কলাকৌশল আয়ত্ত করে নিল।

অবিশ্যি, একটি ব্যাপারে দুর্বলতা তার রয়েই গেল, সেজন্যে পরে দাবাবিশারদরা তার দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকোত। অর্থাৎ, কোন খেলা সে মনে রাখতে পারত না, মানে, চোখ বুজে খেলার ক্ষমতা তার ছিলনা। দাবার ছকের থেকে চোখ ফিরিয়ে, মনে মনে ছকটাকে কল্পনা করে নিয়ে, চাল দেবার কথা মির্কো ভাবতেও পারত না। চোখের সামনে চৌষট্টিটি শাদা-কালো চৌকো চৌকো ঘর আর বত্রিশটি ঘুঁটি মজুত থাকা চাই, নইলে সে একবারে অসহায়। এমন-কি, পরবর্তী যুগে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করার পরও, সে ছোটখাট একটি দাবার ছক—পকেট বোর্ড—সঙ্গে নিয়ে খেলতে বসত। ওই ছক দেখে দেখেই সে খেলাটার আদ্যোপান্ত মহড়া দিয়ে নিত। কোন রকম জটিল সমস্যার উদ্ভব হলে তারও সমাধান করত ওই পকেট বোর্ডের সাহায্যে।

এই ত্রুটিটা এমন-কিছু মারাত্মক নয়। তবে কিনা, খেলোয়াড়ের কল্পনাশক্তির অভাবের নিদর্শন এটা নিঃসন্দেহে। এ নিয়ে আর-আর খেলোয়াড়দের মধ্যে গুজগুজ-ফিসফিসের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্ত থাকত না। এ যেন গানের আসরের সেই নামকরা গাইয়ে বা অর্কেস্ট্রা পার্টির ধুরন্ধর পরিচালক, প্রতিভাবান হওয়া সত্বেও স্বরলিপি না দেখে এগোবার যাঁর সাধ্যি নেই। যাই হোক, এই ত্রুটিটা মির্কোর খ্যাতির পথে অন্তরায় হয়নি, দিনকে-দিন সে খ্যাতির উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে উঠে যেতে লাগল। সতেরো বছর বয়েসে বারো-চোদ্দটা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হল, আঠারোতে পেল হাঙ্গেরীর সেরা দাবাড়ের সম্মান, কুড়িতে পৃথিবী-চ্যাম্পিয়ন।

হুঁদে হুঁদে খেলোয়াড়রা, বুদ্ধিমত্তা কল্পনাশক্তি এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এরা প্রত্যেকেই মির্কোর তুলনায় অনেকগুণ বড় হাজারগুণ শ্রেষ্ঠ হলেও, তার সাথে এঁটে উঠতে পারল না। গেঁয়ো কুতুসভের কাছে বীর নেপোলিঅঁর বা ফেবিআস কাঙ্কটেটরের কাছে দুর্ধর্ষ হ্যানিবলের পরাজয়ের মতই এ এক অত্যাশ্চর্য প্রায়-অলৌকিক ঘটনা। অশিক্ষিত বর্বর এক মাঝির ছেলের হাতে ধরাশায়ী হলেন পৃথিবীর সেরা সেরা দাবাড়েরা। দাবা-খেলোয়াড়দের মধ্যে বিদগ্ধ ব্যক্তির অভাব নেই—অনেক বিখ্যাত দার্শনিক অঙ্কশাস্ত্রবিদ এঞ্জিনীয়র, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ দাবা-জগতে মিলবে। কিন্তু তাঁরাও পরাজিত হলেন এমন একজনের কাছে মাথায় যার গোবড় পোড়া, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অবাঞ্ছিত এক আগন্তুক

মাত্র। বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা দূরস্থান, আদবকায়দা কথাবার্তাও লোকটার এমনই চাষাড়ে যে চতুরতম সাংবাদিকরাও তাকে নিয়ে কোন গল্প ফাঁদতে পারেনা। গল্প ফাঁদতে হলেও তো নায়কের মুখ-নিঃসৃত বাণী চাই দুচারটে!

তবে, রুচিমার্জিত বাণী থেকে খবর-কাগজগুলিকে সে বঞ্চিত করলেও, কাগজওলারা অন্যভাবে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে নিল। তার চালচলন নিয়ে তারা গড়ে তুলল নানা কৌতুককর গালগল্প। কেননা, যতক্ষণ ঝেণ্টোভিক খেলায় মত্ত, ততক্ষণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এবং অতুলনীয়ও। কিন্তু দাবার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমূর্তি, তখন সে এক ভাঁড় বিশেষ, নিছক একটি ভাঁড় ছাড়া কিছু নয়। বেশ-বাস দামী এবং কেতাদুরস্ত, সাজগোজও নিখুঁত, হাতের নখ-গুলি পর্যন্ত সযত্নে ম্যানিকিওর করা,—আচারে-ব্যবহারে কিন্তু যে-কে-সেই!

পাদ্রীসাহেবের সেই পুরাতন ভৃত্য!

তেমনি সংকীর্ণচেতা, তেমনি হীনমনা!

নিজের বিরলদর্শন প্রতিভা এবং খ্যাতিকে অর্থোপার্জনের উপায় ছাড়া আর কিছু বলে ও ভাবতেই পারে না। ভদ্র খেলো-য়াড়োচিত মন ওর নেই, ও চায় শুধু টাকা রোজগার করতে। এজন্যে সময়ে সময়ে এমন বেহায়ার মত কাজ করে বসে, এমন জঘন্য রুচির পরিচয় দেয় যে প্রতিপক্ষরা চোখ কোঁচকায়, নাক সিঁটকোয়, খেপে যায় পর্যন্ত।

ছোট-বড় প্রত্যেকটি শহরে ওর খেলতে যাওয়া চাই

গিয়ে আশ্রয় নেবে সবচেয়ে শস্তা হোটেলে, ফি দিলে যে-কোন ক্লাবে গিয়ে যার-তার সঙ্গে খেলবে—নিজের মান-মর্যাদার কথা ভুলেও ভাববে না। স্রেফ টাকার জন্যে একবার ও এক সাবান-ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞাপনে ওর ফটো ব্যবহারের অধিকার দিয়ে দিল। সকলেই জানে এক লাইন লেখবার ক্ষমতা ওর নেই, তবু ওরই নামে বেরোল এক বই—'দাবাদর্শন'। দাঁও বুজে এক প্রকাশক জনৈক গরীব ছাত্রকে দিয়ে বইটি লিখিয়ে নিয়েছিল।

বাইরের লোক ওর সম্পর্কে যাই ভাবুক, ঝেণ্টোভিকের নিজের মনোবল কিন্তু বেড়ে গিয়েছিল। ও যে এক পৃথিবীবিখ্যাত, পৃথিবীর বিখ্যাততম ব্যক্তি, সে-বিষয়ে পুরোমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল। নামকরা সব জ্ঞানী-গুণীদের ও হারিয়ে দিয়েছে, দাবার জগতে ওর সমকক্ষ কেউ নেই, অন্যান্যদের চেয়ে অনেক-বেশি টাকা ও রোজগার করে—এই বোধ জাগায় সঙ্গে সঙ্গে ঝেণ্টোভিকের আগেকার অস্থিরচিত্ততা সংযত হয়ে এল, চাপা গর্বে ভরে গেল মন। হোক এ-গর্ব অহমিকার নামান্তর, হোক এটা লোকের চোখে দৃষ্টিকটু—কিন্তু অলীক যে নয় তা টের পেয়ে গেছে ঝেণ্টোভিক।

তাছাড়া, উপসংহারে বন্ধু বললেন, তাছাড়া ওর মত একটা লোক রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে উঠলে মাথা যে খানিকটা বিগড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি, বলো! গেঁয়ো গণ্ডমূর্খ বছর একুশেকের এক ছোঁড়া যদি দেখে যে সম্বৎসর মাথার

ঘাম পায়ে ফেলে কাঠ চিরে সারা গাঁয়ের লোক যা রোজগার করে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই তার চেয়ে ঢের-বেশি উপার্জন করা যায়, উপার্জন করা যায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নয় স্রেফ চেয়ারে বসে, আঙুল দিয়ে দাবার ঘুঁটি নাড়িয়ে নাড়িয়ে—অহমিকা তাহলে কেন জাগবে না? ধরাকে সরা জ্ঞান কেন করবে না? অধিকন্তু, রেমব্রাঁ বা বীঠোভেন, দান্তে বা নেপোলিয়ঁর নামও যদি তুমি শুনে না থাক, ওর মত অবস্থায় নিজেকে মহাপুরুষ বলে ভাবাই তো তোমার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। মাথায় ওর গোময় বা ঐ জাতীয় যাই থাকুক, একটি বিষয়ে ও সদা-সচেতন—দাবা খেলায় এ পর্যন্ত অপরাজিত। একটানা জিতেই চলেছে। পৃথিবীতে যে দাবা এবং টাকাই সকলের জীবনাদর্শ নয়, জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবার মত আরো অনেক-কিছু রয়েছে—স্বপ্নেও তা ও কল্পনা করতে পারে না। অতএব, সঙ্গত কারণেই, নিজেকে ও যা-খুশি ভাবতে পারে—মহাপুরুষ তো কোন্ ছাড়।

বন্ধু থামলেন।

তাঁর কথা শুনে আমার মনে বিশেষ একটা কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বাতিকগ্রস্ত বা বিদঘুটে প্রকৃতির লোকদের প্রতি, সকলেই জানেন, আমার গোপন আকর্ষণ রয়েছে। মানুষ তার নিজের গণ্ডিকে যত-বেশি সংকীর্ণ করে আনে, তত-বেশি সে হয়ে ওঠে অতিলৌকিক। পৃথিবী-বিমুখ এই সব অনন্যসাধারণ মানুষেরা ছোট্ট স্বতন্ত্র নিজস্ব একটি পৃথিবী গড়ে নেয়। এই বাস্তব পৃথিবী নয়, নিজেদের মনগড়া সেই

কাল্পনিক পৃথিবীর অধিবাসী এরা। এদের চালচলন তাই বিচিত্র এবং অভিনব—অন্যের নজির অচল এখানে।

ঠিক করলাম, লোকটিকে পরখ করে দেখতে হবে। রিও পর্যন্ত আমরা একই সঙ্গে যাব, বারো দিনের পথ, ওকে চোখে চোখে রাখব এই সময়টা।

বন্ধু হুঁশিয়ার করে দিলেন, সে চেষ্টা করে লাভ নেই হে, সাধ না পুরিবে আশা না মিটিবে! যদ্দূর জানি, আজ পর্যন্ত কেউ ঝেণ্টোভিকের মস্তিষ্কে কোনরকম ধূসর পদার্থ আবিষ্কার করতে পারেনি। এমনিতে যত গলদই থাক, নিজের বুদ্ধিমত্তা যাতে না ফাঁস হয়ে যায় সেদিকে উনি পুরোদস্তুর সেয়ানা। এর জন্যে এক সহজ সরল পথ ও বেছে নিয়েছে—খেলার সময় অতি-দরকারী দু' চারটে কথাবার্তা ছাড়া অন্য সময় মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে থাকে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখোমুখি হলেই শামুকের মত গুটিয়ে নেয় নিজেকে। তাই ও কোনদিন আহাম্মকের মত কথা বলেছে, বা কোন বিষয়ে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে—এমন অপবাদ ওর নামে কেউ দিতে পারবে না। যাবৎ মূর্খ ন ভাষতে—

কার্যত দেখলাম, বন্ধুর উক্তিই সত্যি। হক কথাই তিনি বলেছেন।

প্রথম কদিন তো ঝেণ্টোভিকের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারলাম না। অবিশ্যি, অভদ্রের মত গিয়ে হামলা করতে পারতাম, কিন্তু সে আমার রীতিবিরুদ্ধ।

মাঝে মাঝে ঝেণ্টোভিককে ডেকের ওপর দেখা যায়। গম্ভীর, দুহাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ, গভীর চিন্তায় আত্মগত—নেপলিয়ঁর সর্বজনপরিচিত ছবিটির মত। তখন গিয়ে তো আর গায়ে পড়ে আলাপ জমানো যায়না। তাছাড়া, এই দ্যাখ ও ডেকে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে, পরমুহূর্তে বেমালুম বেপাত্তা। ওর সাথে আলাপের সুযোগ খুঁজলে ছায়ার মত অনুসরণ করতে হবে, থাকতে হবে তক্কে তক্কে।

অনুসরণ করবই বা কোথায়? লাউঞ্জে, বারে, স্মোকিং রুমে কোথাও ওর পদার্পণ ঘটে না। গোপনে এক বয়ের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, প্রায় সারাটা দিন ও নিজের কেবিনে কাটায়। বড়গোছের একটা দাবার ছক সামনে পেতে একা-একাই খেলে।

তিন-তিনটে দিন কেটে গেল, ওকে ছুঁতেও পারলাম না। এবার আমি চটে গেলাম মনে মনে। এযে দেখছি আমার

আলাপের ক্ষমতা চেয়ে ওর এড়িয়ে চলার বাহাতুরীই বেশি! আমাকেই কি তবে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হবে?

এর আগে ব্যক্তিগতভাবে কোন বড় দাবাড়ের সংস্পর্শে আমি আসিনি। তাই ওর সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনাটা মনে আমার ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। চৌষট্টিটি ছোট ছোট শাদা-কালো ঘরকে কেন্দ্র করে একটি মানুষের সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, তার জীবনব্যাপী সাধনা আবর্তিত হচ্ছে—ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ জাগে।

দাবা সম্পর্কে নিজের কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি জানি দাবার আকর্ষণ কী ভয়ানক। এ-খেলায় লোকে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। এ-খেলার হারজিতে ভাগ্যের দোহাই চলেনা—বুদ্ধিরই এতে জয়জয়কার। অন্য সব খেলার সঙ্গে দাবার তফাৎ এইখানে। দাবা খেলা মানে বুদ্ধির খেলা।

দাবাকে নিছক খেলা হিসেবে অভিহিত করা কি ঠিক? এ কি এক ধরনের বিজ্ঞান বা শিল্পকলা নয়? দাবাকে কি বিজ্ঞান ও শিল্পকলার আশ্চর্য এক সংমিশ্রণ বলা চলে না? পুরনো হয়েও দাবা চিরনতুন। শুধু আঙ্কিক মন থাকলেই হয় না, সেই সঙ্গে চাই কল্পনাশক্তির অবাধ বিস্তার। দাবার ছকটি জ্যামিতিক মাপজোকে তৈরী বটে, কিন্তু যতটুকু চোখে দেখা যায় ততটুকুর মধ্যেই কি ওটা সীমাবদ্ধ? খেলার নিয়মকানুন বাঁধাধরা, তবু প্রতিটি ঘুঁটির প্রত্যেকটি চালে নতুন আবিষ্কারের নেশার রোমাঞ্চ। খেলোয়াড়ের তুর্ভাবনার অন্ত থাকেনা, অথচ এ-তুর্ভাবনা একদিক দিয়ে একেবারেই নিরর্থক। কত হিসেব

করে চাল দিতে হয়, এই হিসেবের কড়ির যোগফল কিন্তু শূন্য। এও এক ধরনের শিল্প সন্দেহ-কি, অথচ এ থেকে কোন শিল্প-সৃষ্টি হয়না। ভাস্কর্যও একে বলতে পারলো, তবে অবয়বহীন।

আর, সবচেয়ে বড় কথা, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সব রকম পুথিপত্র একদিন-না-একদিন পুরনো হয়ে যায়—ব্যতিক্রম শুধু দাবা। এ সর্বজনীন, সর্বকালীন। পৃথিবীতে দাবা খেলার প্রবর্তন কবে এবং কোন্ মহাপুরুষ করেছিলেন কেউ জানে না, তবে এটুকু সকলেই জানে—ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করে তুলতে হলে, বিনা পানীয়ে অঢেল উত্তেজনা পেতে হলে দাবার শরণ ছাড়া গতি নেই।

এত সহজ এর নিয়মকানুন যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে এ-খেলা শিখে ফেলতে পারে। মূকও দাবার নামে বাচাল হয়, পঙ্গু পায় গিরিলঙ্ঘনের প্রেরণা। তাই বলে সকলেই কিন্তু বাহাদুরী দেখাতে পারেনা। শাদা-কালো ওই ছোট ছোট ঘরগুলি নতুন এক প্রতিভার স্রষ্টা। সার্থক দাবাড়ে অঙ্কশাস্ত্রবিদ নয়, কবি নয়, বা সঙ্গীত রচনাতেও সে হয়ত অপারগ—তবু এদের সকলের গুণাবলীই তার মধ্যে একযোগে রয়েছে। সার্থক দাবাড়েদের তাই আর কারো সাথে তুলনা করা যায়না। এ এক স্বতন্ত্র অনন্য-সাধারণ প্রতিভা।

এই রকম কোন প্রতিভার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে বিশেষজ্ঞরা হয়ত বলে দেবেন, ওর ধূসর পদার্থের ওপর অমুক

অমুক স্নায়ুর অতিরিক্ত প্রভাববশত, বা দাবাস্নায়ু জাতীয় একধরনের নতুন-কোন স্নায়ুর উৎপত্তির ফলে, কিম্বা দাবার প্রতি বিশেষ-একটা প্রবণতার দরুন ইনি এমন বিখ্যাত দাবাড়ে হয়ে উঠেছিলেন। বলুন ক্ষতি নেই, কিন্তু ঝেণ্টো-ভিকদের বেলায় কি বলবেন? এও কি এক সত্যিকারের প্রতিভা?

দাবা যে প্রতিভার স্রষ্টা, সন্দেহ নেই। আমিও সেকথা আগেই বলেছি। নিজেও তা জানি আমি। এবং মানিও। কিন্তু শাদা-কালো কয়েকটি ঘরের মধ্যেই যার মানস-পরিক্রমা গণ্ডিবদ্ধ, বাস্তব জীবনটা তার কেমন? ভেবে ভেবেও এর কূলকিনারা আমি পাইনে। বত্রিশটি ঘুঁটিকে আগে-পিছে এপাশ-ওপাশ নাড়াচাড়ার মধ্যে দিয়েই যে জীবনের চরমানন্দ পেতে চায়, বড়ের বদলে ঘোড়ার চাল দিয়ে খেলা শুরু করেও যে জয়ী হয়, বোর্ডে আঁকা ঘরে একটা কাঠের রাজাকে কোণঠাসা করবার জন্যে দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অটুট নিষ্ঠায় কাটিয়ে দেয়—রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তার পরিচয় জানবার কৌতূহল আবার অন্তহীন।

আর এতদিনে, এই প্রথম, তেমনি একটি লোককে আমি নাগালে পেয়েছি। আমার থেকে মাত্র ছটি কেবিন পরে সেই আজব প্রতিভা (প্রতিভা, না বিভ্রমসৃষ্টি-কারী মূর্খ—কী বলব?) অবস্থান করছে, কিন্তু এমনই দুর্ভাগা আমি যে তার কাছেও ঘেঁষতে পারছিনে। মানসিক জটিলতা-সম্পন্ন লোকদের সম্পর্কে আমার অতিউগ্র কৌতূহল প্রবল

ভাবাবেগেরই নামান্তর, সেই ভাবাবেগের তাড়নায় বৃথাই আমি উদ্‌ব্যস্ত হয়ে মরছি।

সম্ভব-অসম্ভব নানা মতলব মাথায় এল। কোন বিখ্যাত কাগজের সংবাদদাতা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ওর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করব? এই ভাবে উস্কে দেব ওর অহমিকাকে? নাকি, মোটা আয়ের কথা বলে ওর লোভকে খুঁচিয়ে তুলে স্কটল্যাণ্ড সফরের আমন্ত্রণ জানাব? কী এখন করি আমি?

শেষ পর্যন্ত বার করা গেল উপায় একটা। শিকারীরা যেমন হাতী দিয়ে হাতী ধরে, আমিও তেমনি ঠিক করলাম দাবা-খেলোয়াড় হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে ওকে আমি প্রতিযোগিতায় আহ্বান করব। নান্য পন্থা।

দাবা আমি খেলি বটে, তাই বলে দাবা-পাগল নই। জগৎ-সংসারের কথা ভুলে গিয়ে দাবা খেলতে বসিনে আমি। কেননা, দাবা আমার কাছে নিছক খেলা, অবসর বিনোদনের উপায় ছাড়া কিছু নয়। ভেবে মরবার জন্যে আমি দাবা খেলিনে, দাবা খেলার মারফৎ মনটাকে কিছুক্ষণের জন্যে সমস্ত রকম দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিতে চাই শুধু। আমার দাবা খেলা আসলে খেলাই, কিন্তু আসল দাবাড়েদের কাছে এ এক জীবন-মরণ সমস্যা বিশেষ।

দাবা, ঠিক প্রেমের মতই, একা একা খেলা যায় না। জাহাজে আর-কোন দাবাপ্রেমিক আছেন কিনা এখনো জানিনে, দেখতে হবে।

অতঃপর গতানুগতিক প্রথায় আমি এক ফাঁদ পাতলাম। স্মোকিং রুমে স্ত্রীকে (ইনি আবার আমার চেয়েও এককাঠি সরেশ) নিয়ে দাবার ছক পেতে বসলাম। মহা উৎসাহে খেলা শুরু করে দিলাম দুজনে।

বড় জোর পাঁচটি কি ছটি চাল দেওয়া হয়েছে, যেতে যেতে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর পাশে এসে দাঁড়ালেন। একটু পরেই আরেকজন। সবিনয়ে তিনি আমাদের খেলা দেখবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দেখতে দেখতে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত এক প্রতিদ্বন্দ্বীও জুটে গেল।

লোকটির নাম ম্যাকাইভার। আলাপ-পরিচয় হল — স্কটল্যাণ্ডে বাড়ি, ফাউণ্ডেশন-এঞ্জিনীয়র, ক্যালফোর্নিয়ায় তেলের ব্যবসা করে রীতিমত ফেঁপে উঠেছেন। লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা, চৌকো চোয়াল, শক্ত সুবিন্যস্ত দন্তপাটি, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। এবং গাত্রবর্ণের এই ঔজ্জ্বল্য যে হুইস্কি প্রভাবং, পুরোপুরি না হোক অংশত অন্তত, তাতে সন্দেহ নাস্তি। বিশাল-বিরাট দুই কাঁধ তার খেলার সময় বেখাপ্পাভাবে উঁচু হয়ে থাকে, কেমন-একটা অস্বস্তি জাগায়।

মনে হয়, ম্যাকাইভার তাদেরই অন্যতম জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্যকেই যারা একান্ত করে দেখে, অতিসাধারণ খেলা-ধুলোতে পরাজয়ও যাদের কাছে চরম অপমানের শামিল। জীবনে জয়ী হয়ে হয়ে, যেনতেন প্রকারেন জয় অর্জন করে করে, নিজের ওপর এর একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে —চেহারায় চালচলনে তারই অভিব্যক্তি প্রকট। কোনরকম

বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়াকে এ রীতিমত অপমানকর বলে মনে করে। অপমান যদি না-ও হয়, তার বিরোধিতা করা যে ঘোরতর অন্যায় তাতে ভুল নেই বিন্দুমাত্র। আত্মম্ভরিতার তুরীয় মার্গে সর্বদা এ বিচরণশীল।

প্রথমবারে হেরে গেল ম্যাকাইভার। হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল পরাজয়ের হেতু বিশ্লেষণ। ডিক্টেটর সুলভ ভঙ্গিতে খেলাটার আগাগোড়া বিশদ বর্ণনা দিয়ে উপসংহারে জানাল, মুহূর্তের ভুলেই তাকে হারতে হল। নইলে—নইলে কক্‌খনো সে হারত না।

তৃতীয়বার হেরে গিয়ে বলল, পাশের ঘরে যা গোলমাল হচ্ছে, বাপস্! এর মধ্যে খেলা যায় মাথা ঠিক রেখে!

তবে কিনা, হেরেও ম্যাকাইভার পিছু হটে না, পরাজয়ের প্রতিশোধ কামনায় দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, নতুন করে শুরু করে খেলা।

ম্যাকাইভারের এই তড়পানিকে প্রথমে আমি আমল দিইনি, আমার বরং মজাই লাগছিল। কিন্তু খানিক পরেই দেখলাম, ওর এই তড়পানি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই সহায়ক হবে। অতএব একে হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। দাবার আসর সরগরম হয়ে উঠলে চ্যাম্পিয়ন মশাই কি আর এখানে ঢুঁ না মেরে থাকতে পারবেন? হাত তাঁর সুরসুর করে উঠবেনা!

তৃতীয় দিনের দিন সফল হল আমার আশা, পুরোপুরি নয় অবিশ্যি—আংশিকভাবে। ডেক থেকে জানালা দিয়ে আমাদের খেলা দেখে থাকুক, বা নিজের উপস্থিতি দিয়ে

স্মোকিং রুমকে কৃতকৃতার্থ করার মানসেই হোক—ঝেণ্টোভিক তো ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকে দেখল, তার ব্যবসার সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা স্রেফ পুতুল খেলা খেলছি। দেখে বোধ করি মনে মনে আহতই হল। টুকটুক করে এগিয়ে এল তখন কয়েক পা। তারপর, বেশ-কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে, তাকিয়ে রইল আমাদের ছকের দিকে। অবজ্ঞা-মেশানো কৌতূহলী দৃষ্টিতে।

ম্যাকাইভারের চাল দেওয়ার পালা এবার। তার চাল দেওয়া দেখেই ঝেণ্টোভিক বুঝে নিল দৌড় আমাদের কদ্দূর। নাক সিঁটকে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল ঘর থেকে।

তার এই উন্নাসিকতায় আমি ক্ষুণ্ণ হলাম। তবুও মনের ভাব চেপে ম্যাকাইভারকে খোঁচা দিয়ে বললাম, বুঝলেন মশাই, আপনার চাল দেখে কর্তা বোধ হয় খুশি হলেন না।

কর্তা? কর্তা আবার কে এল?

খুলে বললাম। যে লোকটি এই মাত্র আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, আমাদের খেলা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল—ওরই নাম ঝেণ্টোভিক। আন্তর্জাতিক দাবা-চ্যাম্পিয়ন।…তা আমাদের খেলা দেখে ও মুখ ফিরিয়েছে তো বড় বয়েই গেছে—আমরা তো আর চ্যাম্পিয়ন নই। ওর মত খেলা খেলব কি করে? মধুর অভাবে কি গুড় দিয়ে কাজ চালায় না মানুষ? চালাতে হয় না?

ম্যাকাইভারকে প্রবোধ দেবার জন্যেই বললাম শেষের কথাগুলি। কিন্তু আশ্চর্য, আমার কথার ফল হল অপ্রত্যাশিত।

সঙ্গে সঙ্গে সে খেলায় ইস্তফা দিয়ে দিল, উত্তেজনায় সর্বশরীর তার কাঁপছে থরথর করে।

ঝেণ্টোভিক? ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ন ঝেণ্টোভিক!

ঝেণ্টোভিক যে এই জাহাজেই যাচ্ছে, ম্যাকাইভার জানত না। যাক, জেনে ভালোই হল। ঝেণ্টোভিকের সঙ্গে একহাত তাকে খেলতেই হবে। জীবনে সে একবার মাত্র এক চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে খেলেছে। তাও আবার সরাসরি নয়, জোট খেলা। একদিকে ছিল তারা চল্লিশজন, অন্যদিকে একা সেই চ্যাম্পিয়ন। সে-খেলায় ম্যাকাইভার প্রায় জিতেই গিয়েছিল, মুহূর্তের ভুলে সব গুবলেট হয়ে গেল। সে-খেলার কথা ভাবলে আজো রোমাঞ্চে ওর শরীর শিরশির করে ওঠে। ভালো কথা, ঝেণ্টোভিকের সাথে কি আমার আলাপ আছে?

বললাম, না।

আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে খেলবার জন্যে ওঁকে নেমন্তন্ন করলে হয় না?

হয় না। কেননা আমি জানি যে অচেনা অজানা নতুন লোকের সঙ্গে দহরম-মহরমে ঝেণ্টোভিক নারাজ। তাছাড়া, আমাদের মত আজেবাজে খেলোয়াড়ের সঙ্গে ও খেলতেই বা রাজি হবে কেন?

কথাটা বেফাঁস বলে ফেললাম। ম্যাকাইভারের মত মানুষ কিনা আজেবাজে খেলোয়াড়!

ক্ষেপে গেল ম্যাকাইভার। টান হয়ে বসল চেয়ারে।

চড়া সুরে বলল, কোন ভদ্রলোকের বিনীত অনুরোধ ঝেণ্টোভিক উপেক্ষা করতে পারে, ও বিশ্বাস করেনা। কথায় কি কাজ, দেখাই যাক না পরখ করে ?

তারপর ঝেণ্টোভিককে দেখতে কেমন মোটামুটিভাবে আমার কাছ থেকে জেনে নিয়েই ম্যাকাইভার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। এক্ষুনি গিয়ে চ্যাম্পিয়নকে পাকরাও করতে হবে।

বানচাল হয়ে গেল আমাদের অর্ধসমাপ্ত খেলা। জানি তো, এই সব বৃষস্কন্ধ লোকেরা হয় ভয়ানক একগুঁয়ে। যা করবে বলে একবার গোঁ ধরে তা না করা পর্যন্ত হাল ওরা ছাড়ে না।

প্রতীক্ষায় রইলাম। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত আমিও বড় কম হইনি।

মিনিট দশেক পরে ম্যাকাইভার ফিরে এল। শুকনো মুখে।

কি হলো ?

আপনি ঠিকই বলেছিলেন ! ম্যাকাইভার গজরাতে লাগল, লোকটা একদম ভদ্রতা জানে না, মশাই ! সেধে গিয়ে আলাপ করলাম, নিজের পরিচয় দিলাম,—আর ও পকেট থেকে হাতটা পর্যন্ত বার করল না ! স্পষ্ট বললাম, আপনি যদি মেহেরবানি করে আমাদের সাথে দু হাত খেলেন—সবাই আমরা যারপরনাই কৃতার্থ হব, তামাম জাহাজের লোক নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করবে—শুনেও ভিজল না। বলে কি, দুঃখিত ! বিনা ফিতে ওনার নাকি খেলবার উপায় নেই ! টুরে

বেরুবার আগেই নাকি এজেণ্টের সঙ্গে এই রকম চুক্তি হয়েছে ! আর, ফি কত জানেন ? সবচে কম হল আড়াই শ ডলার— প্র-তি বা-রে !

শুনে আমি না হেসে পারলাম না। একটা লোক শুধু শাদা-কালো ঘরের ওপর ঘুঁটি চালিয়ে চালিয়ে এত রোজগার করতে পারে এ আমার ধারণাতীত।

ওর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়, হেসে বললাম, আশাকরি আপনিও ওরই মত ভদ্রতা দেখিয়েছেন ?

ম্যাকাইভার কিন্তু হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, কাল তুপুর তিনটেয় খেলা হবে। এখানে, এই ঘরে। উনি যা ভেবেছেন সেটি হচ্ছে না, অত সহজে আমাদের কাৎ করতে উনি পারবেন না।

কী বলছেন আপনি ! আমি স্তম্ভিত। ওকে আড়াই শো ডলার দিতে রাজি হয়ে গেছেন ?

না হয়ে কি করি বলন ! এটাই যে ওর পেশা। ধরুন, আমার যদি দাঁতের ব্যথা হত, আর এই জাহাজে যদি একজন ডেণ্টিস্ট থাকতেন—তাহলে ভিজিট না দিয়ে তাঁকে আমি ডাকতে পারতাম ? বলুন, পারতাম ডাকতে ? এ-ও তেমনি। ডেণ্টিস্টের মত ওরও ভিজিট চাওয়ার অধিকার আছে। মহাপুরুষরা সবক্ষেত্রেই মহাব্যবসায়ী। তবে আমি নিজে মশাই ব্যবসায় বেশি ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করি না। দয়া করে খেলবার জন্যে প্রথমে পায়ে ধরে সাধাসাধি করব, আবার খেলা শেষ হলে হাত কচলাতে কচলাতে ধন্যবাদ জানাব—তার

চেয়ে ওকে ওর পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। ওসব দয়া-ধর্মের ধার আমি ধারি না। একটানা ম্যাকাইভার বলতে লাগল, তাছাড়া, কোন ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়নের সাথে না খেলেও দাবার আড্ডায় অমন অনেক আড়াই শো ডলার চোখ বুঁজে আমি ছুঁড়ে দিয়েছি, বুঝলেন?···আমার মত আজেবাজে একজন খেলোয়াড় যদি ঝেণ্টোভিকের কাছে হেরেও যায়, লজ্জার কি আছে?

শুনে কৌতুক বোধ করলাম। 'আজেবাজে' কথাটা একেবারে আঁতে গিয়ে ঘা দিয়েছে বেচারার। দুঃখও একটু হল। আমার কথায় ক্ষেপে গিয়েই না এই কাণ্ডটি ও করে বসল। এখন আর বাধা দিয়ে ফল নেই।

বাধা দেবার ইচ্ছেও বড় নেই। যাক, এই সুযোগে আমার প্রার্থিত ব্যক্তিটির ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তো লাভ করব।

কথাটা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুটে গেল চার-পাঁচজন খেলোয়াড়। কালকের প্রতিযোগিতায় এরাও অংশ নিতে চায়। লোকজনের যাতায়াতের দরুণ খেলায় যাতে না কোন রকম ব্যাঘাত হয়, আমাদের টেবিলশুদ্ধ আশেপাশের টেবিলগুলি পর্যন্ত ওরা রিজার্ভ করে ফেলল।

পরের দিন। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে—অর্থাৎ স্মোকিং রুমে—হাজির সবাই। খোদ কর্তার বিপরীত দিকের মাঝের আসনে, বলা বাহুল্য, ম্যাকাইভার উপবিষ্ট।

ম্যাকাইভার বেশ-কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হুর্দম কড়া সিগার টানছে, একটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরাচ্ছে আরেকটা। ঘনঘন তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ছটফট করছে অস্বস্তিতে।

প্রায় মিনিট দশেক দেরি করে ঝেণ্টোভিক এসে ঘরে ঢুকল : দেরি করে নিজের দর বাড়াল আর-কি! ধীরে ধীরে সে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল, নির্বিকার চিত্তে। নমস্কার জানান দূরে থাক, ফিরেও তাকাল না কারো দিকে। ভাবখানা এই—আমি যে কে তা তোমরা জানো, তোমরা কে তা জানার গরজ আমার নেই।

নমস্কার জানাল না বটে, তাই বলে মুখ বুজেও রইল না। প্রথমেই চশমখোর বেহায়া ব্যবসাদারের মত গড় গড় করে বলে গেল তার খেলার শর্তাবলী। আলাদা আলাদা খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছক জাহাজে মিলবে না, অতএব তার প্রস্তাব—একটি ছকেই খেলা হোক। একদিকে একা সে, অন্যদিকে বাকি সবাই। প্রত্যেক বার চাল দিয়ে সে আসন ছেড়ে উঠে যাবে, ঘরের ওই কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

তার উপস্থিতিতে আমাদের সলাপরামর্শের যাতে কোনরকম ব্যাঘাত না হয় তাই এই ব্যবস্থা। আমরা চাল ঠিক করে ওকে ডাকব। ডাকব কি করে? এখানে তো টেবিল-বেল নেই? গেলাশে চামচে ঠুকে আমরা টুংটাং শব্দ করব, তাই শুনে ও আসবে। উপসংহারে ঝেণ্টোভিক বলল: আমরা যদি খুশি হই, প্রত্যেক চালের জন্যে দশ মিনিট পর্যন্ত সময় ও দিতে পারে। তার বেশি নয় কিন্তু।

অনুগত ছাত্রের মত ওর প্রতিটি প্রস্তাব আমরা শিরোধার্য করলাম বিনা দ্বিধায়।

শুরু হল খেলা। ঝেণ্টোভিক কালো বল বেছে নিল। প্রথমবার আর বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাল দিয়েই চলে গেল ঘরের এক কোণায়। গিয়ে একটা সচিত্র পত্রিকার ওপর চোখ বুলোতে লাগল নিরাসক্ত ভাবে।

খেলার পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যা হবার তাই হল। চব্বিশবারের পর আমরা গোহারা হেরে গেলাম।

এতে আশ্চর্য হবার কিছুই অবিশ্যি নেই। আমাদের মত পাঁচ-ছ জন দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়কে পৃথিবীর সেরা দাবাড়ে বাঁ হাতে খেলে হারিয়ে দেবে, বিস্ময়ের এতে কি আছে! এই তো স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রমই বরং হত বিস্ময়কর। তবু আমরা ক্ষুণ্ণ হলাম। ক্ষুণ্ণ হলাম ওর ডাঁট দেখে। ও যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে ওর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলেরও যুগ্যিও আমরা নই। প্রত্যেকবার

এমন হেলাফেলা করে চাল দেয়, একই সঙ্গে দাবার ছকের এবং আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন আমরাও এক-একটি কাঠের ঘুঁটি! কী হেনেস্থা! ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে লোকে এই রকম ব্যবহার করে। তার দিকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেয় বটে, কিন্তু চেয়েও ছাখে না। আমরাও কি ওর চোখে—? কী আস্পর্ধা!

অথচ, ওর কি উচিত ছিল না, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দেওয়া? একটু প্রবোধ দিতে, ত্নু-একটা মিষ্টি কথা বলে আমাদের কিছুটা উৎসাহিত করতেও তো পারত?

সাধারণ শালীনতাবোধটুকুও নেই। মানুষ না, ও এক দাবা-মেশিন। আকৃতিটা মানুষের মত বটে, প্রকৃতিটা নয়। দাবা খেলায় জেতা ছাড়া ত্নুনিয়ায় আর কিছু ও জানেনা। খেলা শেষ হতেও একটা বাড়তি কথা বলল না! 'মাৎ।' শুধু এই শব্দটি উচ্চারণ করে টেবিলের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নীরব জিজ্ঞাসায় যেন জানতে চাইল— আমাদের কি আরও খেলার শখ আছে?

শখ আমার মিটে গিয়েছিল, ওর সঙ্গে পরিচিত হবার শখ। চোখে-মুখে আমি চরম বিতৃষ্ণার ভাব ফুটিয়ে তুললাম। লেন-দেনের সম্পর্ক শেষ, আর কি, এবার বিদেয় হলেই হয়। খুরে তোমার সহস্র দণ্ডবৎ!

হঠাৎ ম্যাকাইভার আমার পাশ থেকে চাপা স্বরে গর্জে উঠল, এর শোধ চাই! প্রতিশোধ চাই!

শুনেই আমি চটে গেলাম।

চটে গেলাম, চমকে উঠলাম। মুখের হাবভাব বদলে গেছে ম্যাকাইভারের—আর ওকে ভদ্রলোক বলে এখন মনে হচ্ছেনা, ও যেন আক্রমণোদ্যত এক মুষ্টিযোদ্ধা, হিংস্র আক্রোশে ঝিকিয়ে উঠেছে দুই চোখ। ঝেণ্টোভিকের অভদ্রতায় ও এরকম চটে গেল? নাকি, পরাজয়ের ফলে আহত অহমিকাই ওকে এমন মারমূর্তি করে তুলেছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু, ম্যাকাইভার যে বদলে গিয়ে একেবারে অন্য মানুষ—বন্য মানুষ—হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। মুখ রক্তাভ, থরথর নাসারন্ধ্র। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে ঠোঁট, চৌকো চোয়ালের পেশীগুলি প্রকট।

অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, ওর দুই চোখে জীবনপণ জুয়াড়ীর উগ্র আলো, আত্মসম্বরণের ক্ষমতা ও হারিয়ে ফেলেছে।

বুঝলাম, ম্যাকাইভার এখন বেপরোয়া। ঝেণ্টোভিকের সঙ্গে খেলবার জন্যে ও এখন সর্বস্ব বাজি রাখতেও প্রস্তুত। না খেলে ওর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। এক নয়, একাধিক-বার—বারবার খেলবে। অন্তত একটি বার ওকে জিততেই হবে। ঝেণ্টোভিকও যদি এখন রাজি হয়ে যায়, তাহলে তো তার পোয়া বারো। বুয়েনস-আয়ার্সে পৌঁছতে পৌঁছতে কোন্-না দু'দশ হাজার বাগিয়ে নেবে, অনায়াসে!

ঝেণ্টোভিকেব কিন্তু কোন বিকার নেই। সবিনয়ে সে বলল, ইচ্ছে করলে আপনারা এবার কালো নিতে পারেন।

দ্বিতীয় খেলাতেও কোন উনিশ-বিশ হল না।

তবে হ্যাঁ, সংখ্যায় এবার আমরা বেড়ে গেলাম।

উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে আরও জনাকয়েক যাত্রী এসে বসে গেলেন আমাদের পাশে।

ম্যাকাইভার নির্নিমেষ তাকিয়ে ছকের দিকে। অনন্যমন। মনের জোরেই ও যেন জিততে চায়, আমাদের জেতাতে চায়। বেশ বুঝছি, একবার শুধু চিৎকার করে 'কিস্তি' শব্দটি উচ্চারণের সৌভাগ্যের আশায় আড়াই শো ছাড়, হাজার ডলার ও দিতে রাজি খুশি মনে।

ওর উত্তেজনা আমাদের মধ্যেও অজান্তে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকবার চাল দেবার সময় এখন আমরা আগের চেয়ে আরো-বেশি করে আলোচনা করছি, আরো গভীর ভাবে ভাবছি। ঝেণ্টোভিককে ডাকবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত ভেবে ভেবে আমরা সারা হই। আমাদের অবস্থাও এবার আগের তুলনায় অনেক ভালো—আমাদের একটি বড়েকে আর এক ঘর টিপতে পারলেই আরেকটি দাবা পড়বে। কিন্তু এতেও আমরা বড় স্বস্তি বোধ করছি না। এর পেছনে আবার ঝেণ্টোভিকের কী টোপ আছে কে জানে! লোভ দেখিয়ে আমাদের মাৎ করবার মতলব নির্ঘাৎ। কিন্তু মতলবটা যে কী তা-ও ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছিনে। যাক, শেষ পর্যন্ত যা থাকে বরাতে ভেবে ম্যাকাইভার বড়েটা টিপতে যাচ্ছে, হঠাৎ কে যেন তার কনুইটা মুঠো করে ধরে চাপা উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে উঠল, আরে আরে .করেন কি! করেন কি! ও চাল কক্ষনো দেবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমরা ফিরে তাকালাম।

ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। বোধ হয় মিনিট কয়েক আগে এসেছেন, নিজেদের সমস্যা নিয়ে মশগুল ছিলাম বলে এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি। ভদ্রলোককে আমি ডেকে পায়চারী করতে দেখেছি। দেখে অবাক হয়েছি। মুখখানা অস্বাভাবিক রকম লম্বাটে। রঙ খড়িমাটির মত ধবধবে শাদা, মনে হয় এক ফোঁটা রক্ত নেই। তখনি ওঁকে দেখে আমার কৌতূহল জেগেছিল।

আমাদের সমবেত দৃষ্টির সামনে তিনি যেন একটু থতমত খেলেন। গড়গড় করে বলতে লাগলেন, যদি আপনারা দাবা পড়েন তাহলে গজকে উনি পরের চালেই ধরবেন, তখন ঘোড়া দিয়ে গজকে মারতে হবে। উনি তাহলে বড়ে টিপে নৌকো ধরবেন। তারপর আপনারা ঘোড়া দিয়ে কিস্তি দিলেও বাঁচবার কোন উপায় আর থাকবে না। ন'দশ চালেই একেবারে খতম হয়ে যাবেন। ১৯২২ সালে পিস্তানীর প্রতিযোগিতায় হুবহু এই রকম ঘটেছিল। এই ভাবেই এ্যালেকাইন বোগুলযোবভকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।

শুনে ম্যাকাইভার বিমূঢ়। তাড়াতাড়ি সে বড়ে থেকে হাত সরিয়ে নিল। নিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে।

অবাক চোখ তাকিয়ে আছি আমরাও। আমাদের উদ্ধারের জন্যে ইনি যেন দেবদূতের মত নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে। ন' চাল আগেই যিনি খেলার পরিণাম বলে দিতে পারেন

তিনি যে প্রথম শ্রেণীর পাকা খেলোয়াড় তাতে সন্দেহ নেই। হয়ত-বা, আসন্ন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার উনিও এক প্রতিযোগী। প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেই চলেছেন বোধ হয়।

আমাদের চরম সংকটে ওঁর এই আকস্মিক আবির্ভাবকে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম সবাই।

ম্যাকাইভারই প্রথম কথা বলল, আপনি তাহলে কি করতে বলেন? বলে ব্যাকুল ভাবে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাল।

আগন্তুক বললেন, এখন এগোবেন না, বরং এড়িয়ে যান। রাজাকে এক ঘর পিছিয়ে এনে আগে বিপদ কাটান। তাহলে হয়ত উনি অন্যদিক দিয়ে আক্রমণ করবেন। আপনারা তখন নৌকোকে সরিয়ে নেবেন। মাত্র আর দুটো চাল সবুর করুন না, ওঁর একটা বড়ে তো মারা যাবেই, জেতাও অত সহজ হবে না। আপনারা যদি ঠিকমত গা বাঁচিয়ে চলতে পারেন, চাই-কি, খেলাটা তাহলে চটে যেতেও পারে।···এছাড়া আপনাদের পক্ষে আর কোন পথ নেই।

জলের মত বুঝিয়ে দিলেন। বুঝলাম আমরা। বুঝে হয়ে গেলাম তাজ্জব। সত্যি, কী দূরদৃষ্টি! এরই মধ্যে তিনি এতসব কথা ভাবতে পেরেছেন? শুধু ভাবা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছেন? তাঁর কথা শুনে মনে হল, ছাপানো বই থেকে যেন গড় গড় করে খানিকটা মুখস্ত বলে গেলেন।

অপ্রত্যাশিত ফল লাভের আশায় তাঁর গায়ে-পড়া ভাবটাকে আমরা উপেক্ষা করলাম। হারাতে না পারি, পৃথিবীর সেরা দাবাড়ের সঙ্গে সমান সমান অন্তত যাব—ড্র হবে—এতেই আমরা কৃতার্থ।

তাড়াতাড়ি সবাই সরে বসে ওঁকে ভালো করে ছকটা দেখবার সুযোগ করে দিলাম।

ম্যাকাইভার ফের জিজ্ঞেস করল, তাহলে রাজা এক ঘর সরেই বসি, কি বলেন?

নিশ্চয়ই। এখন আত্মরক্ষাই একমাত্র কাজ।

তাঁর নির্দেশমত চাল দিল ম্যাকাইভার। তারপর ঘণ্টা বাজাল, মানে, গেলাশের সঙ্গে চামচে ঠুকে টুংটাং শব্দ করল।

যথারীতি হেলতে দুলতে সামনে এসে দাঁড়াল ঝেণ্টোভিক। ছকটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাজার ঘরের বড়েটা চালল।

আমাদের নাজানা হিতাকাঙ্ক্ষীর ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেল হাতে হাতে, অক্ষরে অক্ষরে।

উত্তেজিতভাবে উনি ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, নৌকো, নৌকো—আরে নৌকোটাকে চালুন। বড়েটা ওঁকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু বাঁচাতে উনি কিছুতেই পারবেন না। যাক—ওঁর বড়ে নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না, এরপর ঘোড়া চাললেই খেলার মোড় ঘুরে যাবে। আর আত্মরক্ষা নয়, এবার চালান আক্রমণ।

ভদ্রলোককে যে হড়বড় কি বলছেন, কী বলতে চাইছেন—আমরা ধরতে পারলাম না। বোধ হয় উনি চীনা ভাষায়

কথা কইছেন—তাই কিছু বুঝতে পারছিনে। কিন্তু না যাক বোঝা, ম্যাকাইভার এখন ওঁর যন্ত্রে পরিণত। ওঁর কথামত আবার সে চাল দিল। আবার আমরা গেলাশে চামচে ঠুকে ডাকলাম ঝেণ্টোভিককে।

এবার—এবং এই প্রথমবার—ঝেণ্টোভিক এসেই হুট করে চাল দিলনা। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছকের দিকে। রীতিমত চিন্তিত, কুঁচকে এসেছে কপাল, জুড়ে গেছে ভুরু দুটি।

তারপর সে চাল দিল—আগন্তুকের কথাই হল সত্যি।

ও যে এই চাল দেবে আগেভাগেই যেন জানতেন তিনি।

চাল দিয়ে যাবার জন্যে পিছন ফিরল ঝেণ্টোভিক। কিন্তু তার আগে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। কি ভেবে হঠাৎ সে মুখ তুলে আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখল, সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। অর্থাৎ, বিস্মিত ও-ও বড় কম হয়নি। ওর অনায়াস জয়ের পথে হঠাৎ এমন বাধা সৃষ্টি হল কি করে? কে করল?

এরপর ঘুরে গেল খেলার মোড়। না, মোড় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল না, তবে নতুন এক উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম আমরা। জয়ের কথা এতক্ষণ কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি, কিন্তু ঝেণ্টোভিকের দিকে তাকিয়ে, তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে, আমাদের বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল হাজার গুণ।

আমাদের নতুন বন্ধুর তর সয় না। ঝেণ্টোভিকের চাল শেষ হওয়া মাত্র ম্যাকাইভারের চাল তিনি দেখিয়ে দিলেন। আমিও ঝেণ্টোভিককে ডাকবার জন্যে সোজা হয়ে

বসলাম। গেলাশে চামচে ঠুকতে গিয়ে হাত আমার কেঁপে গেল।

জয়ের আশা আর তুরাশা নয়।

এতক্ষণ ঝেণ্টোভিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাল দিচ্ছিল, দিচ্ছিল নেহাৎ হেলাফেলা করে। এবার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে রইল, অনেকক্ষণ ধরে ইতস্তত করল। শেষ পর্যন্ত চেয়ার টেনে বসলও। বসল অবিশ্যি ধীরে-সুস্থে, কিন্তু ও যে এখন রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেছে তাতে কোন ভুল নেই। মনের ভেতরের কথা না হয় বাদই দিলাম, বাহ্যিক চালচলনেও সেটা গোপন থাকছে না।

যাক, এরপর যদি হারিও, আপসোস থাকবে না—কেননা, এটুকু অন্তত চ্যাম্পিয়ন মশাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে একেবারে ফেল্না আমরা নই।

ছকের দিকে তাকিয়ে ঝেণ্টোভিক ঝিম মেরে বসে আছে। চোখের পাতা নেমে এসেছে, তারা তুটি আর চোখে পড়ে না। একটু একটু করে হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখখানা, কিম্ভুত কুৎসিৎ হয়ে উঠছে।

অনেক ভেবেচিন্তে চাল দেওয়ার পর উঠে দাঁড়াল ঝেণ্টোভিক।

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, বাঃ, চমৎকার চাল। কিন্তু দমবার কিছু নেই। পালট করতে বাধ্য করুন, পালট ওঁকে করতেই হবে। বাজি তাহলে চটবেই, খোদ ভগবানও ওঁকে রক্ষা করতে পারবেন না।

যথারীতি তাই করল ম্যাকাইভার।

তারপর শুরু হল, যাকে বলে, বাঘের খেলা। খেলছে ওরা দুজনে, আমরা শুধু আসর আলো করে বসে আছি। আমাদের ভূমিকা অবিশ্যি বাতিল হয়ে গিয়েছিল আগেই, তবু খেলাটা এতক্ষণ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু ওদের ঘুঁটির লড়াই এবার আমাদের কাছেও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। মাথামুণ্ডু কী যে হচ্ছে কিছুই ছাই বুঝছিনে। চোখ ছানাবড়া করে আমরা স্রেফ অবলোকন করে যাচ্ছি।

সাতবারের বার ? বোধ হয়। সাতবারের বার চাল দিয়ে ঝেণ্টোভিক শুধু বলল, ড্র—সমান সমান।

মুহূর্তে সারা ঘরে নেমে এল স্তব্ধতা। কারো মুখে রা নেই। বাইরে ঢেউয়ের একটানা গর্জন। রেডিওতে বাজনা বাজছে, ড্রয়িং-রুম থেকে ভেসে আসছে তারই মৃদুমধুর আওয়াজ। ডেকে যেন কারা পায়চারী করছে, সুস্পষ্ট প্রত্যেকটি পদক্ষেপ। জানালায় সমুদ্রহাওয়ার হাহাকার। আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে যেন। ঘটনাটা এতবেশি আকস্মিক যে তার ধাক্কাটা কিছুতেই আমরা সামলে উঠতে পারছিনে। হঠাৎ অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে কেমন-একটা আতঙ্কে সবাই অভিভূত। আমরা তো প্রায় হেরেই গিয়েছিলাম, অনিবার্য পরাজয়ের হাত থেকে কি করে রেহাই পেলাম ? কে এই আগন্তুক এই অসাধ্য সাধন যে করল ? কে এ ? এ কে ?

হেঁঃ হেঁঃ বাবা ! ম্যাকাইভারের আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর

চাপা রইল না। চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। শ্বাস ছাড়ল সশব্দে।

আমি তাকালাম ঝেণ্টোভিকের দিকে। খেলার শেষ দিকে ওর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু সব অবস্থাতেই ডাঁট কি করে বজায় রাখতে হয় ও জানে।

কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ও ঘুঁটিগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি, আরেক হাত খেলবেন নাকি?

এ অবিশ্যি নিছক একটা কথার কথা। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল, ম্যাকাইভারকে উপেক্ষা করে ও এবার সরাসরি তাকাল আমাদের মুক্তিদাতার দিকে। ঘোড়া যেমন নতুন সওয়ারের বসার ভঙ্গি দেখেই তার দৌড় কত বুঝতে পারে, ঝেণ্টোভিকও তেমনি টের পেয়ে গেছে আসলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে?

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরাও ফিরে চাইলাম আগন্তুকের দিকে।

থতমত খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই ম্যাকাইভার তার স্বভাবসুলভ অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল, আলবৎ! আল-বৎ খেলা হবে! তবে, এবার ইনি আপনার সঙ্গে একা খেলবেন— আপনারা দুজনে খেলবেন, আমরা শুধু দেখব।

এরপর ঘটল আরেক আশ্চর্য ব্যাপার। কি জানি কেন, আগন্তুক তখনো ছকের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন,

ম্যাকাইভারের কথা শুনে তিনি যেন চমকে উঠলেন। সকলে তাঁরই দিকে চেয়ে আছে টের পেয়ে ছটফট করতে লাগলেন অস্বস্তিতে।

আমতা আমতা করে বললেন, না না, আমায়—আমায় আপনারা মাপ করবেন। ও অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব—আমায় দয়া করে বাদ দিন। কুড়ি, উহু, প্রায় বছর পঁচিশেক হল আমি দাবা খেলিনে·· ···বুঝতে পারছি অন্যায় হয়ে গেছে আমার, এভাবে আপনাদের খেলায় বাধা দেওয়া উচিত হয়নি···আমার ত্রুটির জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আপনারা খেলুন, আর আমি বাধা দেব না। বলতে বলতে আমাদের একেবারে হতচকিত করে রেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন, ঝড়ের বেগে।

অসম্ভব! শূন্যে ঘুষি উঁচিয়ে ম্যাকাইভার বলল, এ হতেই পারেনা। উনি পঁচিশ বছর খেলা ছেড়ে দিয়েছেন—বললেই হল! আগে থেকেই যিনি প্রত্যেকটা চাল আর পাল্টা চালের কথা বলে দিতে পারেন, তিনি কিনা পঁচিশ বছর—অসম্ভব! বললেই আমরা বিশ্বাস করব? হ্যাঁ মশাই, যায় বিশ্বাস করা?

শেষ প্রশ্নটা ম্যাকাইভার করল ঝেণ্টোভিককে।

এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা সাজেনা। গম্ভীর ভাবে ঝেণ্টোভিক বলল, তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোকের খেলাটা অদ্ভুত ধরনের, অবাক খানিকটা লাগে ঠিকই। তাইত ওঁকে আমি ইচ্ছে করে আরেকটা চান্স দিতে চাইলাম। এই বলে সে

উঠে দাঁড়াল। তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ স্বরে ফের বলল, উনি বা আপনারা যদি কাল ফের খেলতে চান, জানাবেন। বেলা তিনটের পর আমি রেডি থাকব।

আমরা আর হাসি চাপতে পারলাম না, শুরু হয়ে গেল ফিসফিসানি। সকলেই বুঝছি, দয়াপরবশ হয়ে ঝেণ্টোভিক তার নাম-না-জানা প্রতিদ্বন্দ্বীকে চান্স দিচ্ছে না। ছেলে মানুষের মত নিজের মনোব্যথাকে এই বলে ও ঢাকতে চাইছে, এই মৌখিক ভদ্রতার আবরণটুকু দিয়ে। ওর দেমাক ভেঙেছে, উচু মাথা নুয়ে পড়েছে, থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে— খুশি আমরা হব না ?

শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধ মানুষ আমরা, আর এখন আমাদেরই মধ্যে যেন জেগে উঠল যুদ্ধের উন্মাদনা। মাঝদরিয়ায়, আমাদের এই জাহাজেই, ঘটে যেতে পারে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা—বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নের চ্যাম্পিয়নশিপে চিড় ধরতে পারে, নতুন এক রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে দাবা-জগতে। কালই পৃথিবীর সর্বত্র সে খবর ফলাও হয়ে বেরোবে, শুরু হয়ে যাবে দুনিয়াজোড়া আলোড়ন।

ভাবতে ভাবতে রক্ত আমাদের গরম হয়ে উঠল। যুদ্ধং দেহি ! যুদ্ধং দেহি !

এতো গেল একদিকের কথা। অন্যদিকে আবার রয়েছে রহস্যের দুর্বার আকর্ষণ। চরম সংকটে যিনি আমাদের উদ্ধার করলেন, কে তিনি ? তিনি কে ? .দাবার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের স্রষ্টা হিসেবে ভাগ্যদেবীই কি তাঁকে

পাঠিয়ে দিয়েছেন? নাকি, ইনিও কোন বিখ্যাত খেলোয়াড়? নিজের পরিচয়, যে কারণেই হোক, আপাতত গোপন রাখছেন।

জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেল! যার যা মনে আসছে বলছে, উত্তেজিত সকলেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য হল ভদ্রলোকের বিনয়। বিনয় আর লজ্জা। দুই-ই আশ্চর্য। কুড়ি-পঁচিশ বছর উনি দাবা খেলেননি? এর পরেও একথা বললেন? বললেন অত সবিনয়ে, অমন সন্ত্রস্তভাবে? কেন? কেন?

এক মহা ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমরা।

তবে, একটি বিষয়ে সবাই আমরা একমত: কালকের সুযোগ কোন মতেই ছাড়া হবেনা। ঝেণ্টোভিকের সঙ্গে খেলতে, যে-করেই হোক, রাজি ওঁকে করাতেই হবে।

ঝেণ্টোভিকের ফি দিতে ম্যাকাইভার প্রস্তুত। এরি মধ্যে এক বয় প্রমুখাৎ জানা গেল যে ওই নাম-না-জানা ভদ্রলোকের বাড়ি অস্ট্রিয়ায়। অর্থাৎ, আমার দেশের মানুষ উনি। অতএব, দলের হয়ে আমারই ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা উচিত, বললেন সকলে। আমিও আপত্তি করলাম না।

বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। ডেক-চেয়ারে শরীর এলিয়ে ভদ্রলোক কি-একটা বই পড়ছিলেন। কাছে যেতে যেতে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করলাম।

কেমন-যেন ক্লান্তকরুণ মুখখানি। বয়েসের তুলনায় বার্ধক্যের বলিরেখা এত-বেশি স্পষ্ট, এমন অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ মুখের রঙ যে দেখেই চমক লাগে। চুলগুলি একেবারে শাদা হয়ে গেছে। মনে হয়, হঠাৎ ভদ্রলোক বুড়িয়ে গেছেন রাতারাতি।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যথারীতি ভদ্রতা বিনিময় হল। নিজের পরিচয় দিলেন, অস্ট্রিয়ায় অতিপরিচিত এক অভিজাত বংশে জন্ম। পদবী শুনে আমিও চিনলাম। এই বংশের একজন ছিলেন স্টুবার্টের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আরেকজন প্রাক্তন সম্রাটের গৃহ-চিকিৎসকদের অন্যতম।

আমার প্রস্তাব শুনে ডাঃ বি একেবারে মূক হয়ে গেলেন: ঝেণ্টোভিকের সঙ্গে তাকে খেলতে হবে!

কথা বলে বুঝলাম, ঝেণ্টোভিককে তিনি চিনতেন না। স্বপ্নেও ভাবেননি যে খানিক আগেই পৃথিবীর সেরা দাবাড়ের সঙ্গে তিনি খেলে এসেছেন।

যে কোন কারণেই হোক, ঝেণ্টোভিকের কথা শুনে ডাঃ বি বিশেষ ভাবে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ওর সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। জানতে চাইলেন, সত্যি-সত্যিই ও সর্বজনস্বীকৃত পৃথিবী-চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ে কিনা।

আমারও এতে সুবিধে হয়ে গেল। পরিষ্কার হল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ। তবে, খেলায় হেরে গেলে যে ম্যাকাইভার আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে কথাটা মুখ ফুটে আর

বলতে পারলাম না। ওঁর মত মার্জিতরুচি ভদ্রলোকের মুখের ওপর বলা ও-কথা যায়ও না।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর ডাঃ বি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর ওপর খুব-বেশি আশা করা কিন্তু আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। আমি যেন আগেভাগেই সকলকে তা জানিয়ে দিই।

কারণ, ম্লান হেসে তিনি বললেন, কারণ নিজের ওপর আস্থা আমার নেই। সত্যিই আমি জানিনে কতটুকু আমার সামর্থ্য। তখন যে বলেছিলাম প্রায় বছর কুড়ি হল আমি খেলা ছেড়ে দিয়েছি. এটাকে নিছক বিনয় বলে ভাববেন না। বিশ্বাস করুন, কলেজ ছাড়ার পর কোনদিন আমি দাবার ঘুঁটি ছুঁয়েও দেখিনি। আর, কলেজ-জীবনেও খেলোয়াড় হিসেবে নামডাক আমার ছিল না।

এমন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি কথাগুলি বললেন যে এর সত্যতায় আমার নামমাত্র সন্দেহও রইল না। সন্দেহ রইল না বটে, তবে নিজের বিস্ময়কেও আমি চাপতে পারলাম না। কী অসাধারণ স্মরণশক্তি! বড় বড় দাবাড়েদের প্রত্যেকটি চালের খুঁটিনাটি পর্যন্ত মনে আছে—এত বছর না খেলা সত্ত্বেও? বাস্তবে না খেলুন, দাবার নাড়িনক্ষত্র জানতে তবু বাকি নেই নিশ্চয়?

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখদুটি তুলে আবার হাসলেন ডাঃ বি, সেই ম্লান হাসি।

নাড়িনক্ষত্র জানি? তা একরকম ঠিকই বলেছেন। ঈশ্বর

সাক্ষী, দাবার নাড়িনক্ষত্র আমি সত্যিই 'জানি। কিন্তু, কি করে জেনেছি জানেন? সে এক বিশেষ, উঁহু বিশেষ নয়, অত্যদ্ভুত অবস্থায় পড়ে। সে এক দীর্ঘ কাহিনী, একটানা দুঃখের ইতিহাস। বড় জটিল, ভী-ষ-ণ······আধঘণ্টাটাক সময় আছে হাতে? শুনবেন? বলে পাশের চেয়ারটির দিকে ইশারা করলেন।

সানন্দে আমিও গ্রহণ করলাম তাঁর আমন্ত্রণ।

আশেপাশে কেউ নেই। ডাঃ বি তাঁর পড়বার চশমাটি চোখ থেকে খুললেন। তারপর একপাশে সেটি সরিয়ে রেখে শুরু করলেন—

ভিয়েনার মানুষ হিসেবে আমাদের পরিবারের কথা আপনার মনে আছে—একথা শুনে বড় খুশি হলাম। এজন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তবু মনে হয়, আমাদের ল' অফিসের নাম আপনি শোনেননি। কেননা খবরের কাগজে যেসব মামলা নিয়ে হইচই হত, সেগুলোর দায়িত্ব আমরা নিতাম না। নতুন মক্কেলদেরও আমরা এড়িয়ে চলতাম—এই ছিল আমাদের নীতি। প্রথমে বাবা ও আমি, পরে আমি একাই ব্যবসা চালাতাম। আসলে, নিয়মিত আইন-ব্যবসা তখন আর আমরা করিনে, পুরনো মক্কেলদের পরামর্শ-উপদেশ দিই, আর বড় বড় মঠের বিষয়সম্পত্তির তদারক করি। শেষোক্তটাই প্রধান। এসবের সঙ্গে আমার বাবা, —ভালো কথা, তিনি ছিলেন ক্ল্যারিক্যাল পার্টির এক প্রাক্তন ডেপুটি—ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া, রাজপরিবারের কয়েকজনের বিনিয়োজিত অর্থের তত্ত্বাবধানও আমরা করতাম। রাজতন্ত্র সম্পর্কে আজকের দিনে রেখে-ঢেকে বলবার প্রয়োজন নেই, তাই একথা আপনাকে বললাম।

রাজা ও গীর্জার সঙ্গে আমাদের এ হেন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল দু' পুরুষ আগে। আমার এক কাকা ছিলেন সম্রাটের গৃহ-চিকিৎসক। আরেকজন সেইটেনস্টেটেনের

মঠাধ্যক্ষ। পরম নিষ্ঠায় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কর্তব্য সম্পাদন ছাড়া বিশেষ-কিছু করণীয় আমাদের ছিল না।

নিঃশব্দে—সবার অলক্ষ্যে—আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছিলাম। সবার অলক্ষ্যে—নিঃশব্দে—করবার মতই কাজ। শুধু দুটি গুণের প্রয়োজন হয় এতে—নিষ্কলুষ বিচার-ক্ষমতা, ঐকান্তিক বিশ্বস্ততা। আমার পরলোকগত বাবার এই দুটি গুণই ছিল পুরোমাত্রায়। কার্যত এরই ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার বছরগুলিতেও মক্কেলদের জন্যে তিনি প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন।

তারপর জার্মানীর সর্বেসর্বা হয়ে বসল হিটলার। মঠ-গীর্জার সম্পত্তির ওপর শুরু হয়ে গেল হামলা। ঘনিয়ে এল মহাদুর্দিন। অত্যন্ত মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তিগুলি যাতে রক্ষা পায় সকলেই সেজন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। সীমান্তপারের সঙ্গে গোপন আলোচনা ও লেনদেন শুরু হল। হল আমাদেরই মারফৎ। এ ব্যাপারে ওপরতলার এমন অনেক চাঞ্চল্যকর গোপন খবর আমরা জানতে পারলাম, সাধারণ্যে যার বিন্দু-বিসর্গও প্রকাশিত হবে না কোনদিন।

আমাদের সন্দেহ করার উপায় ছিল না। দরজায় একটা সাইন বোর্ড পর্যন্ত আমরা টাঙাইনি। প্রকাশ্যে রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে চলতাম সযত্নে। দূরে দূরে থাকতাম। সত্যি বলতে কি অস্ট্রিয়ার ধুরন্ধর সরকারী কর্মচারীরাও কোন দিন ভাবতে পারেনি যে, ওই কবছর ধরে রাজপরিবারের গোপন বার্তাবহরা সবচেয়ে মূল্যবান চিঠিপত্রের আদান-প্রদান

করেছে আমাদের —চারতলায় অবস্থিত আমাদের সেই বেনামা অফিসটির—মারফৎ। সকল রকম সন্দেহের অতীত ছিলাম আমরা, তাই সরকারী তদন্তের প্রশ্নও আমাদের ক্ষেত্রে কোন দিন ওঠেনি।

ন্যাশন্যাল সোস্যালিস্টদের—জাতীয় সমাজবাদীদের—আপনি নিশ্চয় ভালো ভাবেই জানেন। ওরা তখন জার্মানীর আশপাশের ছোট ছোট অনগ্রসর দরিদ্র-বঞ্চিত নির্বিরোধ দেশগুলির দিকে নেকনজর দিয়েছে। পৃথিবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা করার, সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার, বহু আগেই এই সব দেশকে তারা অস্ত্রসজ্জিত করতে শুরু করে। অসংখ্য সৈন্যদল গড়ে তুলতে থাক—খোদ জার্মান সামরিক বাহিনীর তুলনায় কোন দিক দিয়ে এরা কম বিপজ্জনক ছিলনা। দুই-ই একেবারে এক ছাঁচে ঢালা।

প্রত্যেকটি অফিসে, প্রতিটি ব্যবসাকেন্দ্রে এরা তখন নিজেদের তথাকথিত 'সেল' অর্থাৎ ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত ওদের ষড়যন্ত্রের জাল, সর্বত্র ওদের গোয়েন্দার পাল। ডলফাস ও শুশনিগের প্রাইভেট চেম্বারে পর্যন্ত ওদের টিকটিকি ঢুকে পড়েছে। এমন-কি, আমাদের অফিসেও।

দুর্ভাগ্য এই, এটা আমরা টের পেয়েছিলাম বড় দেরিতে। তখন আর বাঁচবার পথ ছিলনা।

নগণ্য এক কেরানি। জনৈক পাদ্রীসাহেবের সুপারিশে আমিই তাকে নিয়োগ করি। কাজকর্ম সে কিচ্ছু জানত না, তবু তাকে নিয়েছিলাম অফিসের ঠাটটা বজায় রাখবার জন্যে।

লোককে দেখাবার জন্যে যে, হ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই এটা একটা অফিস। অফিসী কাজ-কারবারই হয় এখানে, আর কিছু নয়।

কোন রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাকে দেওয়া হত না। আজেবাজে চিঠিপত্রের খসড়া করা, টেলিফোন ধরা, বা কাগজপত্র ফাইলে গাঁথা—এই ধরনের কাজ, যেসব কাজের কোনই গুরুত্ব নেই, লোকটা করত। ডাকের চিঠিপত্র খোলার অধিকার তার ছিলনা। গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলি নিজে হাতে আমি টাইপ করতাম, এবং তার কোন কপিও রাখতাম না। জরুরী নথিপত্র আগেই বাড়িতে সরিয়ে ফেলেছিলাম। লোকজনের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকার করতাম অন্যত্র।

এ-রকম সাবধানতার দরুন টিকটিকিটা কিছুই জানতে পারেনি, জানার কথাও নয়। তবু কি-করে-যেন ব্যাটা টের পেয়ে গেল যে তাকে আমরা বিশ্বাস করিনে, তার চোখে ধুলো দিয়ে অনেক-কিছুই চলছে এখানে। হয়ত আমার অনুপস্থিতিতে রাজপরিবারের কোন বার্তাবহ হঠাৎ ভুল করে বসেছে। সম্রাটকে আমরা 'ব্যারন ফার্ন' ছদ্মনামে অভিহিত করতাম, সে হয়ত 'হিজ ম্যাজেস্টি' বলে ফেলেছে। কিম্বা ওই হারাম-জাদাই গোপনে কোন চিঠি খুলে পড়েছে কিনা কে জানে!

কারণ যাই হোক, ওকে আমরা সন্দেহ করবার আগেই ও বার্লিন বা মিউনিক থেকে আমাদের ওপর চোখ রাখবার হুকুমনামা আনিয়ে নিয়েছিল। অনেক দেরিতে, আমার জেল হবারও বেশ-কিছুদিন পরে, এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তখন মনে পড়েছিল, প্রথম প্রথম কাজকর্মে ব্যাটার কুঁড়েমির

অস্ত না থাকলেও শেষের দিকে বড়-বেশি তৎপরতা দেখাতে শুরু করে, একেবারে হঠাৎ। বিশেষ করে, আমার চিঠিপত্র ডাকে ফেলার জন্যে কী তার উৎসাহ! নিজে থেকে সে আমার চিঠিগুলি নিয়ে যেত। চিঠির জন্যে সাধাসাধি করত।

স্বীকার করছি, এ আমার দূরদৃষ্টির অভাব। এর জন্যে আমি দোষী, তাও মানি। কিন্তু, পৃথিবীর তাবৎ কুটনীতি-বিশারদ ও জাঁদরেল জেনারেলরাও কি হিটলারী ধাপ্পাবাজির কাছে আহাম্মক বনেনি, বলুন?

গেস্টাপোর অনুচররা যে তলে তলে আমায় চোখে চোখে রেখেছিল, তা টের পেলাম আমার গ্রেপ্তারের দিন। কঞ্ঝাবাহিনীর লোকরা যে-সন্ধ্যায় আমাকে গ্রেপ্তার করল সেই দিনই শুশনিগ পদত্যাগ করেছেন—হিটলারের ভিয়েনা-অভিযানের আগের দিন সেটা।

ভাগ্যি ভালো, বেতারে শুশনিগের বিদায়বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। এবং, বাকি কাগজপত্র ও সিকিউরিটির অত্যাবশ্যক ভাউচারগুলো চাকরের মারফৎ পাচার করে দিয়েছিলাম কাকার কাছে। এসব করেছিলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে—ওরা আমার দরজায় এসে ঘা দেবার মাত্র খানিকক্ষণ আগে।

ডাঃ বি থামলেন। সিগার ধরাতে গিয়ে ঝিম মেরে রইলেন অনেকক্ষণ।

দেশলাইয়ের আলোয় লক্ষ্য করলাম, তাঁর মুখের ডানপাশের একটা অংশ থরথর করে কাঁপছে।

ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। থেকে থেকে, কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর, জায়গাটা ওই রকম থরথরিয়ে ওঠে। স্নায়ুবিকারের কারণ সম্ভবত। কাঁপনটা এমন-কিছু বেশি নয়, নেহাৎই অনুল্লেখ্য—তবু মনে হল, ওঁর সমগ্র মুখমণ্ডল এক অধৈর্য উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে।

আমরা, যারা প্রাচীন অস্ট্রিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতায় আস্থাশীল ছিলাম, তাদের সকলকেই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চালান করা হয়। আপনি হয়ত আশা করছেন—এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা, মাতৃভূমিকে ভালোবাসার অপরাধে সেখানে যে অমানুষিক অত্যাচার আমাকে সইতে হয়েছে তার মর্মান্তিক কাহিনী, আপনাকে বলব। কিন্তু না, সে-রকম কিছু ঘটেনি। আমাকে ওরা বিশেষ শ্রেণীর বন্দী হিসেবে রাখল। আমার জন্যে হল বিশেষ ব্যবস্থা। দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যে অভাগাদের ওপর ওরা গায়ের ঝাল ঝাড়ত, নিজেদের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করত, তাদের সঙ্গে আমাকে রাখেনি। যাদের নিংড়ে প্রভূত অর্থ বা জরুরী খবরাদি আদায় করা যাবে বলে নাজিরা মনে করত, তাদের ওরা রেখেছিল আলাদা করে। আমিও হলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত।

আমার মত সাধারণ মানুষের কোন দাম গেস্টাপোদের

কাছে ছিলনা নিশ্চয়। অতখানি মর্যাদা আমি দাবিও করিনে। ওরা ধরে নিয়েছিল, শত্রুপক্ষের শিখণ্ডী আমরা, শত্রুপক্ষের বিশ্বাসভাজন। ওদের জাতশত্রুরা আমাদের মাঝখানে রেখে নিজেদের কাজকর্ম চালায়। ওরা আশা করেছিল, আমাকে চাপ দিয়ে গোপন খবরাখবর বার করে নেবে। তারপব, আমার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন মঠাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে চার্জ তৈরী করবে, রাজতন্ত্রের হয়ে ওদের বিরুদ্ধে যারা নিঃস্বার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ তাদের দাঁড় করাবে আসামীর কাঠগড়ায়। সেই সঙ্গে সাক্ষী হিসেবে, বলাই বাহুল্য, আমাকেও। ওরা সন্দেহ করেছিল, সন্দেহটা অবিশ্যি অকারণ নয়, আমরা যে অর্থ লেনদেন করতাম তার একটা বড অংশ এখনো আমাদের কাছে রয়ে গেছে। সেটা আমরা সরিয়ে ফেলেছি, ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি, তার হদিশ পাওয়া দুষ্কর। তাই প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি ওদের বিষদৃষ্টি পড়ল। প্রার্থিত সংবাদ চাই-ই। আর, আদায়ও সেটা করতে হবে অকৃত্রিম নাজি-পদ্ধতিতে।

আমাকে ওরা অর্থ-দোহনের বা সংবাদ-আদায়ের উৎস মনে করেছিল বলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেব নরকে ঠেলে দেয়নি, অ-সাধারণ ব্যবস্থা করেছিল আমার জন্যে। আমাদের চ্যান্সেলর, এবং ব্যারন রথস্‌চাইল্ডের কথা আপনার মনে থাকতে পারে। এই দুই পরিবারকে শোষণ করে অপর্যাপ্ত অর্থ বাগানো যাবে—এই আশাতেই কাঁটাতারের বেষ্টনী-ঘেরা কয়েদখানায় ওঁদের স্থানান্তরিত করা হয়নি। মেট্রো-

পোল হোটেলের কটি ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল, সেই সঙ্গে দিয়েছিল আরাম-আয়াসের প্রচুর সুযোগ-সুবিধে। অবিশ্যি, গেস্টাপোদের সদরদপ্তরও ছিল ওই একই হোটেলে।

নামজাদা হোটেলে একজন মানুষের জন্যে পুরোপুরি একটি ঘর—শুনতেও আনন্দ, না? কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের আনন্দ বিধানের বিন্দুমাত্র গরজ ওদের ছিলনা। নিজেদের মতলব হাসিলই ওদের এক ও অনন্য লক্ষ্য। তাই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে নোংরা অন্ধকার খুপরির বদলে আমাদের মত 'বিশিষ্ট' ব্যক্তিদের জন্যে এই রকম ব্যবস্থা—মোটামুটি আরামদায়ক হোটেলে এক-এক জনের আস্ত এক-একখানা ঘর!

এও ওদের স্বীকারোক্তি আদায়ের এক ফন্দি—টেকনিক! ওরা জানত, মারধর করে বা দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে এক্ষেত্রে সুবিধে হবে না। এগোতে হবে সুকৌশলে, অবলম্বন করতে হবে সূক্ষ্ম উপায়। অন্যভাবে চাপ দিতে হবে। এর জন্যে বাইরের পৃথিবী থেকে আমাদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা প্রয়োজন, প্রয়োজন নির্জন নির্বাসন।

না, কোন দুর্ব্যবহার ওরা আমাদের সঙ্গে করল না। শুধু আমাদের সঁপে দিল নিঃসীম শূন্যতার কবলে। কেননা, ওরা জানত, শূন্যতার অভিশাপই মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। শূন্যতার পীড়ন সইতে পারে না মানুষের আত্মা।

প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে রাখল। অসীম শূন্যতায় আমরা অন্তরীণ হলাম। জগৎ-সংসারের সঙ্গে কোন

সম্পর্ক আমাদের রইল না। ওরা ভেবেছিল, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অমানুষিক বাহ্যিক নির্যাতনের বদলে আত্মার ওপর এই রকম নির্মম অত্যাচার চালালেই আমরা ঠোঁট খুলব, খুলতে বাধ্য হব।

আমার কামরাটি এমনিতে ভালোই, প্রথম দর্শনে মন মোটেই বিরূপ হয় না। ঘরে রয়েছে একটি দরজা, একটি টেবিল, একটি চেয়ার, একটি শয্যা, হাতমুখ ধোবার বেসিন একটি, আর কাঁটাতারে ঢাকা জানালা। তা-ও একটি। দরজা বন্ধ দিনরাত। টেবিলটি শূন্য একেবারে। কিছু নেই—কোন বই না, খবর-কাগজ না, পেন্সিল না, একটুকরো কাগজ পর্যন্ত না। জানালার পরেই উঠে গেছে শক্ত ইটের খাড়া দেওয়াল।

আমার শরীর এবং সত্তা দুই-ই বন্দী হল শূন্যতাব বন্ধকূপে। আমার প্রত্যেকটি জিনিস ওরা ছিনিয়ে নিল। পাছে আমি সময়ের পদধ্বনি শুনতে পাই, পাছে সময়ের হিসেব কষি—নিয়ে গেল ঘড়িটা। পেন্সিলটি নিয়ে গেল, যদি কিছু লিখে স্বস্তি পাই! যদি নিজের শিরা কেটে শান্তি পেতে চাই, পেন্সিল-কাটা ছুরিটাও রাখতে দিল না। এমন-কি, ধূমপানের নেশা থেকেও বঞ্চিত হলাম—সিগার-সিগারেট নিষিদ্ধ। এক প্রহরী ছাড়া কোন মানুষের মুখ চোখে পড়েনা। আর, মুখই শুধু চোখে পড়ে, শুনতে পাইনে মানুষের কণ্ঠস্বর। আমার সঙ্গে কথা বলার অধিকার প্রহরীটির ছিল না, আমার কোন প্রশ্নের জবাব দেবারও নয়।

সকাল থেকে সন্ধ্যে—শূন্যতার অবিচ্ছিন্ন মুহূর্ত যেন জমাট বেঁধে ওঠে। চোখের সামনে শূন্যতার অথৈ বিস্তার, কানে শূন্যতার শেষহীন সুর। শূন্যতার চাপে নিঃসাড় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়। আমি একা, এই বিশাল-বিরাট বহুবিচিত্র পৃথিবীতে একা আমি—বড় ভয়ানক ওই একাকীত্ব! নিজের বলতে আমার আছে শুধু রক্তমাংসের শরীর একটি, আর চার-পাঁচটি জড় পদার্থঃ টেবিল, শয্যা, জানালা, বেসিন। বেসিন, জানালা, শয্যা, টেবিল! আর, এই শরীরটা!

আমি যেন শূন্যতার অন্ধকার সমুদ্রে ডুবন্ত এক জাহাজের নাবিক, লাইফবেল্ট ধরে রয়েছি, এখনো ভেসে আছি, বেঁচে আছি। কিন্তু বাঁচবার কোন আশা নেই। এই শব্দহীন শূন্যতার কারাগার থেকে আমার কণ্ঠস্বর বাইরে গিয়ে কখনো পৌছুবে না। আমার চিৎকার করার অধিকারটুকুও যে আগেভাগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে!

কিছু করবার নেই আমার। দেখবারও কিছু নেই। শোনবারও কিছু না। আমাকে ঘিরে রয়েছে শূন্যতা, শুধুই শূন্যতা। স্থানকালনিরপেক্ষ শূন্যতা। অর্থহীন শূন্যতা। শ্বাস-রোধকারী শূন্যতা।

পায়চারি করি, আমার চিন্তাগুলোও যেন পায়চারি শুরু করে আমার সাথে। একপা এগোই, আমার চিন্তাও যেন পা বাড়ায়। পিছোই, আমার চিন্তাও যেন পিছু হটে। আমি দুলি, দুলতে থাকি, চিন্তাও যেন আমার অবিরাম দোলনে দুলে চলে। সে-চিন্তারও মানে নেই কোন।

না থাক মানে, তবু চিন্তারও ত বাস্তব একটা ভিত্তি থাকা দরকার ?

কিন্তু, আমার চিন্তা স্বয়ম্ভূ। চিন্তার থেকেই এ চিন্তার জন্ম, চিন্তাকে কেন্দ্র করেই চিন্তা আমার ঘুরপাক খায়। আমার চিন্তাও তলিয়ে গেছে শূন্যতার অতলে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে—সকাল-সন্ধ্যে—একটি মানুষ ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসে থাকে : যদি কিছু ঘটে !

হায়, কিছু ঘটেনা ! কি-ছু-ই না ! তবু সে প্রতীক্ষা করে। প্রতীক্ষা। শুধুই প্রতীক্ষা ! প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা, আর প্র-তী-ক্ষা ! তবু সে ভাবে। শুধুই ভাবে ! ভাবে, ভাবে, আর ভাবে—যতক্ষণ না কপালের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে পড়তে চায়,—সে ভাবে, শুধু ভেবেই চলে ! তবু কিছু ঘটেনা। একেবারে কিছুই না ! একাই সে থেকে যায়। একা ! একেবারে নিঃসঙ্গ !

দিন পনেরো এই রকম চলল। এই পনেরো দিন আমি কাটালাম সময়হীন নিরবয়ব অন্য-কোন পৃথিবীতে। এদিকে তখন যদি বিশ্বযুদ্ধও শুরু হয়ে যেত, টের পেতাম না। কেননা, আমার বিশ্ব বলতে শুধু একটি টেবিল আর একটি দরজা। একটি বেসিন, একটি শয্যা আর একটি চেয়ার। একটি জানালা। আর, ওই খাড়া দেওয়াল ! এ-সবের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রতিটি ঘাঁজঘোঁচ, মনে আমার গাঁথা হয়ে গেছে। আমার মস্তিষ্কের পরতে পরতে ওর ছাপ পড়ে গেছে। একেকবার ওগুলোর দিকে চোখ পড়ে, আর কে-এক

ইস্পাত-ভাস্কর যেন ছেনি-বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে আমার মস্তিষ্কে ওগুলির—ওই টেবিল-দরজা-বেসিন-শয্যা-জানালা-দেওয়ালের—প্রতিকৃতি তৈরী করতে বসে যায়।

অবশেষে, দিন পনেরো পর, আরম্ভ হল জেরা।

হঠাৎ একদিন শমন পেলাম।

দিন? দিন, না রাত্রি, জানিনে। শমন পেলাম, এই মাত্র। আমাকে তলব করা হল।

এ-বারান্দা ও-বারান্দা দিয়ে আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোন চুলোয় কে জানে! এক জায়গায় এসে থামলাম। কোথায় থামলাম, তাও নাজানা। দেখলাম, একটি টেবিলের সামনে আমি দাঁড়িয়ে, ওপাশে বসে ইউনিফর্ম পরা লোক একটা। টেবিলে নানা কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ। কিন্তু কিসের কাগজ কিসের দলিল, জানিনে আমি।

শুরু হল সওয়াল। হরেক রকমের প্রশ্ন। সত্যি, মিথ্যে। সরল, জটিল। ধরতাই বুলি, অবান্তর বাকচাতুরী। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। অনর্গল। বিরামবিহীন।

একেকটি প্রশ্নের জবাব দিই, আর টেবিলের ওপর গুটিকয় কুৎসিৎ আঙুল কেঁচোর মত কিলবিলিয়ে ওঠে, দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে, রেকর্ড করতে থাকে। ভগবান জানেন, কিসের দলিল ওগুলো! কী যে ওরা রেকর্ড করছে তাও জানেন শুধু ভগবানই!

এইসব সওয়াল-জবাবে আমার আতঙ্ক হত। সে-আতঙ্ক অন্য কারণে।—আমাদের অফিসের কাজকর্ম

সম্পর্কে কি জানে গেস্টাপোর সাকরেদরা? কতটুকু জানে? আমার কাছ থেকে কী ওরা জানতে চায়?—কোন মতেই এটা আমি বুঝে উঠতে পারতাম না। আতঙ্ক আমার তাই।

শেষ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি আমি চাকরের মারফৎ কাকার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—সেকথা আপনাকে আগেই বলেছি। কিন্তু, আমি তো পাঠিয়ে ছিলাম, তাঁর হাতে গিয়ে সেগুলো ঠিকঠিক পৌঁছেছিল তো? যদি না পৌঁছে থাকে? সেই কেরানি হারামজাদা কতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে? সবই কি সে-ব্যাটা জানতে পেরেছিল? কোন কোন্ চিঠি এরা গোপনে খুলে পড়েছে? যেসব মঠের প্রতিনিধিত্ব আমরা করতাম, সেখানকার জনাকয়েক ভীরু কাপুরুষ পাদ্রীকে মোচড় দিয়ে এরি মধ্যে অনেক তথ্য বের করে নেয়নি তো?

প্রশ্ন তো নয়, বন্যার তোড়। ভাবনাচিন্তা দূরে থাক, দম ফেলবারও ফুরসৎ দিতনা।—অমুক মঠের হয়ে কত টাকার সিকিউরিটি আমি কিনেছি? কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের কাজকারবার চলত? অমুককে আমি চিনি না চিনি না? সুইটজারল্যাণ্ড বা অমুক অমুক দেশের সঙ্গে কি আমার পত্র বিনিময় হয়েছিল?—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার অবস্থা এদিকে রীতিমত শোচনীয়। কতখানি ওরা জানতে পেরেছে সেটা বুঝতে না পারায় আমার পক্ষে জবাব দেওয়া বিপজ্জনক হয়ে উঠল। কি বলতে কি বলব কে জানে! হয়ত ওরা ধাপ্পা দিচ্ছে, আমি যদি ধরা দিই—সত্যিটা

যাবে তখন ফাঁস হয়ে। আবার, সবই যদি অস্বীকার করে বসি—তাহলে হয়ত নিজেরই ক্ষতি। সেটা হবে সাধ করে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত।

তবু বলব, এই সওয়াল-জবাবের অধ্যায়টাই আমার দুর্দশার চরমতম অবস্থা নয়। চরমতম অবস্থা হল—সওয়াল-জবাব শেষে আবার সেই শূন্য ঘরে প্রত্যাবর্তন।

আবার সেই নিঃসীম শূন্যতা। আবার সেই অতিপরিচিত টেবিল আর শয্যা, বেসিন আর চেয়ার আর জানালার মুখোমুখি হওয়া। মুখোমুখি হওয়া নিজের।

নিজের মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত আত্ম-রোমন্থন। কি জবাব আমি দিয়েছি? কি দেওয়া উচিত ছিল? পরের বারে কোন্ প্রশ্নের কি জবাব দেব? কোন্টা স্বীকার করব, কোন্টা করব না? আমার কোন বেফাঁস কথায় ওদের যদি সন্দেহ জেগে থাকে, পরের বার কি বলে সেটাকে চাপা দেব?

ফেলে ফিরে আমার জবাবের প্রত্যেকটি শব্দকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতাম। মনে মনে পুনরুক্তি করতাম প্রতিটি প্রশ্নের, সেই সঙ্গে আমার জবাবেরও। আমার যেসব কথা ওরা টুকে নিয়েছে সেগুলোকে আলাদা করবার চেষ্টা করতাম, যদিও জানি, একেবারেই তা অসম্ভব। এবং অবাস্তব।

আমার ভয়-ভাবনা সেই নিঃসীম শূন্যতায় রাশমুক্ত হওয়া মাত্র মনের মধ্যে কেবলি পাক খেতে থাকত। একবার শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ফের শুরু হত, নতুন নতুন পথে মোড় নিত। হানা দিতে থাকত ঘুমের ঘোরেও।

প্রত্যেকবার গেস্টাপোর জেরার কবল থেকে রেহাই পাবার পরও এই চিন্তার হাত থেকে আমার মুক্তি ছিলনা। নিজের মনই তখন আরো-হাজারো প্রশ্ন করত, প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত আমার মনকে। গেস্টাপোর প্রশ্নের চেয়েও এই প্রশ্ন আরো বেশি—আরো অনেকগুণ বেশি—মারাত্মক। আরো ভয়ঙ্কর, আরো হৃদয়বিদারক। কারণ, ওদের সওয়ালের মেয়াদ বড়-জোর এক ঘণ্টা। ঘণ্টাখানেক পরেই ওদের কবল থেকে উদ্ধার মেলে। কিন্তু, আমার এই মানসিক রোমন্থন অশেষ। ঘণ্টা-মিনিটের গণ্ডিতে একে বাঁধা যায় না।

নির্জনতার এই দুঃসহ নির্যাতনের জন্যে একদিক দিয়ে আমি কৃতজ্ঞ।—এ ছাড়া কী সম্বল ছিল আমার? মনের জীবন্ততার আর কী অবলম্বন ছিল? শুধু ওই অতিপরিচিত টেবিল-চেয়ার-শয্যা-দেওয়াল-জানালা। খাড়া দেওয়াল! এর এতটুকু ব্যতিক্রম নেই। আর কিছু নেই। কিছুই না! বই না, পত্রিকা না। মানুষের মুখ না। একটা পেন্সিল পর্যন্ত নেই যে আঁকিবুকি কেটে মনকে অন্তত ভোলাব। একটা দেশলাইয়ের বাক্স থাকলেও নাড়াচাড়া করে সময় কাটাতে পারতাম। তা-ও নেই। কিছুই না, কিছুই নেই—কিছুই আমার নেই আজ! আছে শুধু সীমাহীন শূন্যতা। অগাধ অবাধ অতল শূন্যতা!

এবার বুঝতে পারলাম, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সঙ্গে

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY. Agartala.

পার্থক্যটা কোথায়, কতখানি! এবং, কী ভীষণ! যে-মাথা থেকে এই শয়তানী মতলব বেরিয়েছিল সে-মাথা কত বুদ্ধি ধরে—কী জঘন্য রকম বুদ্ধিমান! সে এক নৃশংস ঘাতক—নির্মম খুনে। তার জিঘাংসা প্রবৃত্তি পশুরও অধম।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীকে হয়ত পাথর ভাঙতে হয়। দুই হাত রক্তাক্ত না হওয়া পর্যন্ত হয়ত তার নিস্তার থাকে না! জুতোর মধ্যেই পা দুটি তার ঠাণ্ডায় হয়ত জমে যায়। হয়ত দশজনের এক গুদোম ঘরে দুশো জনকে রাখা হয় গাদাগাদি করে।

যা-ই হোক, তবু তো মানুষের মুখ তাদের চোখে পড়ে, স্বর শোনে মানুষের? তবু তো মাটির তারা স্পর্শ পায়? একটি গাছ কি একটি তারা, না হয় অন্য-কিছু—যা-হোক-কিছু অন্তত—দেখতে তো পায়? বাইরের দিকে তাকিয়েও তো থাকতে পারে?

আর এখানে? সবকিছু অবিকল, অবিচল, অপরিবর্তনীয়। কাল যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, আজ যেমন আছে কালও এমনি থাকবে। হুবহু এমনি! ভাবলেও মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।

এমন একটা জিনিসও এখানে নেই আমাকে যে এই দুঃসহ ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে, বদলে দিতে পারে আমার মনের গতিপ্রকৃতি, বন্ধ করতে পারে আমার এই বিরামহীন বাধ্যতামূলক রোমন্থন। এযে কী সাংঘাতিক অবস্থা!

আর, ওরাও এ-ই চেয়েছিল। মনের ওপর পীড়ন চালিয়ে চালিয়ে মনটাকে আমার ভেঙে-চুরে-তুমড়ে-মুচড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ওরা। আশা করেছিল, তার ফলে শেষ পর্যন্ত হার না মেনে আমি পারব না। নতি স্বীকারে বাধ্য আমি হবই। যা ওরা চাইছে, যার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে—স্বেচ্ছায় তা আমি তুলে দেব ওদের হাতে। আমার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ওরা তখন মামলা খাড়া করবে।

ভয়াবহ শূন্যতার নিষ্ঠুর পেষণ স্নায়ুমণ্ডলীর ওপব ক্রমেই বেশি-করে অনুভব করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার স্নায়ুমণ্ডলী যেন বিকল হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, এর পবিণাম বড় মারাত্মক। অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করলেই মনে হয়, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ যেন ঘটে যাবে আমার মধ্যে। তবু করি চেষ্টা। কোন্ ছেলেবেলায ঘুম পাড়ানী-গান কি লোকসঙ্গীত শুনেছি, ইশকুলেব জীবনে পড়েছি হোমারের কাব্য—সে-সব এখন মনে করবাব চেষ্টা করি, স্মৃতি থেকে তার অংশবিশেষ আবৃত্তি করি—মনে মনে। শুধু গান, সঙ্গীত, কাব্য নয়—দণ্ডবিধি আইনেব বিভিন্ন ধারা-উপধারাও। শুধু আইনের ধারা-উপধারা নয়—অঙ্কশাস্ত্রও। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সাহায্যে মনে মনে নানা আঙ্কিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলাম।

সবই চেষ্টা!

আমার স্মরণশক্তিও বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। মন বিক্ষিপ্ত সবসময়ে। থেকে থেকে কেবল এক চিন্তা ঝিলিক দিয়ে

ওঠে: কতখানি ওরা জানে? কী ওরা জানতে চায়? গতকাল আমি কী বলেছি—কী বলব আগামীকাল?

এই অবস্থাকে, এক কথায় বলা যায়, অবর্ণনীয়। চার মাস কাটল এই ভাব।

চার মাস!

লেখা সহজ। তুটি শব্দ, চারটি অক্ষর। বলাও সহজ—চার মাস! চার মাস—উচ্চারণ করতে এক সেকেণ্ডও লাগেনা! চার মাস!

কিন্তু, স্থানহীন সময়হীন পটভূমিকায় এই দীর্ঘ সময়টার ভূমিকা যে কী, লিখে তা বলা যায় না, বলে তা বোঝানো যায় না। পরকেও না, নিজেকেও না। এ যে কি করে একটা জীয়ন্ত মানুষের হৃদয়-মনকে কুরে কুরে খায়, তাকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়—অসম্ভব তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। স্থানহীন সময়হীন শূন্যতা! চারদিকেই শূন্যতা, শুধুই শূন্যতা। নেই, নেই—কিছু নেই! কিছুই না। চিরন্তন ওই টেবিল, ওই শয্যা, ওই বেসিন, ওই চেয়ার—আর চিরন্তন এই শব্দহীনতা। আর চিরন্তন ওই প্রহরী—রোজ রুটীন-মাফিক খাবারের থালাটা ঠেলে দেবার সময় বারেকের জন্যেও যে মুখখানি কখনো তোলেনা। আর চিরন্তন এই চিন্তার রোমন্থন—শূন্যতার প্রশ্রয়ে যা মানুষকে কেবলি পিষ্ট করে, পিষ্ট করে চলে যতক্ষণ না সে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়।

আমার মাথাটা যে ঠিকমত কাজ করছে না, ছোটখাট ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা টের পেলাম। পেয়ে হয়ে গেলাম

বিভ্রান্ত। প্রথম দিকে সওয়াল-জবাবের সময় পুরোপুরি হুঁশিয়ার থাকতে পারতাম। নিজের মনের ওপর কর্তৃত্ব তখন বজায় ছিল। আমার দ্বিমুখী চিন্তাধারা—কি আমার বলা উচিত আর কি উচিত নয়—অব্যাহত তখনো।

এখন অবস্থা দাঁড়াল অন্যরকম। সহজ সরল প্রশ্নেও থতমত খাই। জবাব দিতে গিয়ে তোতলাতে থাকি—যখন দেখি, জবাব দিতে-না-দিতে কাগজের ওপর শুরু হয়ে গেছে একটি কলমের দ্রুত খসখসানি। দেখে যেন সম্মোহিত হয়ে যাই। আবার-কখনো কলমের দ্রুতগতির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তবে কি দ্রুততায় নিজের কথার সঙ্গে নিজেই আমি পাল্লা দিতে চাই? এ-কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা হয়ে যায় বন্ধ। হারিয়ে যায় কথার খেই। আশঙ্কায় মন ভরে ওঠে: আসছে, আসছে, সেই চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে যখন আমি—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি যখন—স্বীকারোক্তি করে বসব। যা জানি তা তো বলবই, তার চেয়েও হয়ত বেশি বলে ফেলব। বানিয়ে বানিয়ে বলব। এই শূন্যতার অশরীরী নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় বারো জন মানুষের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব। নিজের কোন লাভ হবে না জেনেও ফাঁস করে দেব তাঁদের গোপন তথ্য। দেব—একবার শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নেবার জন্যে।

এক সন্ধ্যায় সত্যি-সত্যিই আমার অবস্থাটা এই রকম হয়ে দাঁড়াল। মন একেবারে ভেঙে পড়েছে, বিভ্রান্তের মত বসে রয়েছি—প্রহরী খাবারের থালাটা এগিয়ে দিল। তাকে দেখেই

হঠাৎ চাপা আর্তনাদে আমি ফেটে পড়লাম, 'এ্যাই শুনছ? শোনো—আমায় ওখানে নিয়ে চল। সব আমি আজ বলব, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি স্বীকারোক্তি দেব। কোথায় আমাদের টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখা রয়েছে—সব আমি বলব—সব—সব!'

সৌভাগ্যের বিষয়, লোকটা তখন চলে গেছে। আমার কথা সে শুনতে পেল না। কিম্বা, শুনেও হয়ত শুনল না।

এই সংকটজনক মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটল, অপ্রত্যাশিত ভাবে। কিছুটা রেহাই পেলাম, সাময়িক ভাবে হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

জুলাইয়ের শেষ দিক। বষণমুখর অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে দিনটা। সেদিনের ছবি এখনো মনে আমার জ্বলজ্বল করছে। বারান্দার জানালায় জানালায় অবিরাম বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছিল। একটানা ঝিমঝিম শব্দ হচ্ছিল। জেরার জন্যে ওই বারান্দা দিয়েই আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যে-ঘরে জেরা করা হয় তার পাশের ঘরটিতে আমাকে নিয়ে হাজির করা হল। জেরার সময় আসামীদের আগে এই ঘরে নিয়ে আসা হয়। জেরার পূর্ব মুহূর্তে এই ভাবে তাকে প্রতীক্ষমান করে রাখাও এক ধরনের চাতুরী। এ-ও ওদের স্বীকারোক্তি আদায়ের টেকনিক একটা।

আচমকা আসামীকে তলব করে তার স্নায়ুর ওপর প্রথমে একটা প্রচণ্ড ঘা দেয়। কথা নেই বার্তা নেই, মাঝরাত্তিরে হঠাৎ তার ঘুম ভাঙাল, তারপর হিড়হিড় করে টেনে আনল সেল থেকে। তার মধ্যে তখন শুরু হয়ে যায়

ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। সেল থেকে আসতে আসতে ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। উত্তেজনায় হয়ে যায় দিশেহারা। তবু সে জোর করে নিজেকে সংযত রাখে, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে। ন্যায় ও সত্যকে তুলে ধরতে চায়। প্রাণপণে শক্তি ও সাহসে বুক বাঁধে। এটা সাময়িক? হোক সাময়িক, জেরার মেয়াদও তো বেশিক্ষণ নয়।

ওদিকে, সে যখন একেবারে তৈরী, সাময়িক সাহসে সাহসী শক্তিতে শক্তিমান—তখন তাকে বলা হল প্রতীক্ষা করতে, এই পাশের ঘরে।

বড় নিদারুণ এই প্রতীক্ষা, বড় দুঃসহ। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা—কতক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকতে হবে কোন ঠিকঠিকানা নেই।

ধীরে ধীরে তার উত্তেজনা তখন ঝিমিয়ে আসে, উবে যেতে থাকে সাময়িক সাহস সাময়িক শক্তি। ক্লান্তিতে ছেয়ে যায় দেহ-মন। কী-যে অকথ্য গ্লানিকর এই ক্লান্তি!

কেন-যেন ওই দিনটিতে ওরা আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রেখেছিল। বৃহস্পতিবার, সাতাশে জুলাই। ঘড়িতে দু-দুবার ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনলাম, পাশের ঘরে ঠায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। পাথরের মূর্তির মত।

দিনটা স্পষ্ট মনে থাকার আরও-একটি বিশেষ কারণ রয়েছে।

ঘরে ছিল একটি ক্যালেণ্ডার। আমাকে ওরা, বলা বাহুল্য, বসতে দেয়নি। দুটি ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো

ভীষণ টনটন করছে, শরীর চাইছে এলিয়ে পড়তে। তবু তাকিয়ে আমি দেওয়ালের দিকে, অনিমেষ। '২৭ জুলাই'— ছাপার অক্ষরে এই কটি অক্ষর দেখে মনের মধ্যে কী প্রবল একটা আলোড়ন জেগে উঠল বলে বোঝানো অসম্ভব। ক্যালেণ্ডারের ছাপা অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে লিখিত বা মুদ্রিত কিছু—যাহোক কিছু—একটা দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। '২৭ জুলাই'—অক্ষর ক'টি গাঁথা হয়ে গেল আবার মস্তিষ্কে।

আরও কিছুক্ষণ আমায় অপেক্ষা করতে হল। অপেক্ষা করে আছি, তলবের প্রতীক্ষা করছি। আর, মনে মনে ভাবছি—আজ ওরা আমায় কি কি প্রশ্ন করতে পারে, কোন্ প্রশ্নের কোন্ জবাব আমি দেব? মনে মনে তার মহড়া দিচ্ছি। যদিচ ভালো ভাবেই জানি, এ অনর্থক, কোন লাভ এতে হবে না। এমন সব প্রশ্ন ওরা করবে, যার সঙ্গে আমার এই মহড়ার কোন সম্পর্কই থাকবে না।

তবু, দাঁড়িয়ে থাকার এই অসহ্য শারীরিক কষ্ট সত্বেও, প্রতীক্ষার এই অমানুষিক মানসিক পীড়ন সত্বেও, আমার এখন ভালো লাগছে। আনন্দ হচ্ছে চারপাশে তাকিয়ে।

হাজার হলেও আমার ঘরের সঙ্গে এই ঘরের তফাৎ রয়েছে, নতুন একটা ঘরে আমি এসেছি। আমার ঘরের চেয়ে এটা বড়, একটির বদলে দুটি জানালা এখানে। সেই শয্যা আর সেই চেয়ার, অতি-পরিচিত সেই জানালা আর সেই বেসিনটি— যা দেখে দেখে চোখ আমার পচে গেছে—এখন আর চোখে

পড়ছে না। চোখে পড়ছে না জানালার সেই ফাটলটি, হাজার-লক্ষ বার যেটা আমি দেখেছি, তবু রোজ—সব সময়—যেটা দেখতেই হয়।

এ একটা অন্য ঘর, নতুন ঘর। এ ঘরের দরজার রঙ আলাদা। ওই যে দেওয়ালের পাশে চেয়ারটি দেখা যাচ্ছে, আমার চেয়ারের সাথে এর মিল নেই। বাঁদিকে কাগজপত্র রাখার একটি আলমারী। আলনায় তিন-চারিটি ভিজে মিলিটারী কোট, আমার ওপর নির্যাতনকারীদের কোট, ঝুলছে।

এই ঘরে এসে আমি অভিনব কিছু-একটা পেলাম, সুযোগ পেলাম নতুন-কিছু দেখবার। আমার তৃষিত দুই চোখ অনেক-খানি তৃপ্তি পেল, স্বস্তি পেল—লোভীর মত তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারপাশ।

অপলক তাকিয়ে রইলাম কোটগুলির দিকে—প্রতিটি কোটের প্রত্যেকটি ভাঁজের দিকে। পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম গভীর ভাবে। যেমন ধরুন, একটি কোটের কলারে টলমল করছে এক ফোঁটা জল, বিস্ফারিত চোখে আমি তাকিয়ে। ওদিকে টলমল করছে জলের ফোঁটা, এদিকে উত্তেজনায় বুক আমার থরথরো। ফোঁটাটা কি শেষপর্যন্ত গড়িয়ে পড়বে মাটিতে? নাকি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানকে অগ্রাহ্য করে থেকে যাবে ওখানেই—শুকিয়ে যাবে আস্তে আস্তে? কী হবে! কী হবে!······শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন, না? ভাবছেন, এ আবার কি পাগলামো!

কিন্তু, বিশ্বাস করুন, সত্যি-সত্যিই এক ফোঁটা জলের

দিকে তাকিয়ে মিনিট কয়েকের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও আমি ভুলে গেলাম—জীবনপণ জুয়ায় যেন অবতীর্ণ আমি।

জলের ফোঁটাটা অবশেষে গড়িয়েই পড়ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তখন কোটগুলির বোতাম আমি গুনতে শুরু করে দিলাম। একটায় আটটি। পাশেরটাতেও তাই। পরেরটায়? আট—উঁহু, আট নয়, দশ। বোতাম গোনা শেষ হল তো দেখতে লাগলাম পদমর্যাদার চিহ্নগুলি, এটার সঙ্গে ওটার শুরু করলাম তুলনা।

এসব অতিসাধারণ ব্যাপার, তবু এই নিয়েই আমি যেন মেতে উঠলাম খেলায়। আত্মহারা হয়ে গেলাম। আমার ক্ষুধিত চোখ দুটি খোরাক পেয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত।

যাক, আমার সে-মানসিক অবস্থার বিশদ বিবরণ আপনাকে আর দেব না।

এই সময়, হঠাৎ, একটা জিনিস দেখে চমকে উঠলাম। দুই চোখ যেন মুহূর্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

দেখি-কি, একটা কোটের ঝুলপকেটে চৌকোমত কি-যেন একটা রয়েছে, খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছে। সন্তর্পণে উঁকি মারলাম। চৌকোমত—কী জিনিস?

তবে কি—?

আর ভুল নেই, পেয়েছি আমি রত্নখনির সন্ধান।

বই!

নির্ঘাৎ ওটা বই।

দুই হাঁটু আমার ঠক ঠক করতে লাগল—বই! বই! বই!

চার-চারটি মাস পড়া দূরে থাক, একটি বই ছুঁয়ে দেখারও সৌভাগ্য আমার হয়নি। বই! কথাটা মনে হতেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বই—সুবিন্যস্ত শব্দাবলীর সমারোহ, সুসমঞ্জস পংক্তি, অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা, পাতা—সব মিলিয়ে একটি বই। বই—মানুষের মস্তিষ্কে যা প্রতি মুহূর্তে নতুন-নতুনতর অনুভূতি জাগায়, খুলে দেয় অজানা জগতের দ্বার, তুলে ধরে রহস্যের যবনিকা। অধীর করে তোলে উত্তেজনায়, বিস্ময়ে বিমূঢ়।

বই! বই!

বইটার একাংশ মাত্র বেরিয়ে আছে, সেই দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম সম্মোহিতের মত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সংযমের বাঁধ একসময় ভেঙে গেল, নিজেকে সামলে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠল। আপনা থেকেই ওই দিকে এগোতে লাগলাম, একটু একটু করে—মন্ত্রমুগ্ধের মত। বইটাকে একবার শুধু ছোঁব, পকেটের ওপর থেকেই বইটি বারেক মুঠো করে ধরব --ভাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙুলগুলি শিরশির করে উঠল। কি করছি জানিনে, কি হবে জানিনে—আমি এগোচ্ছি। এগোচ্ছি মন্ত্রমুগ্ধের মত।

ভাগ্যি ভালো, প্রহরীটা খেয়াল করেনি। কিম্বা, খেয়াল করলেও উদ্দেশ্যটা আমার ধরতে পারেনি। হয়ত ভেবেছিল, একনাগাড়ে দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা কাবু হয়ে পড়েছে, তাই চেষ্টা করছে দেওয়ালে ঠেস দেবার।

একপা আধপা করে করে শেষ পর্যন্ত কোটটার কাছাকাছি

গিয়ে পৌঁছলাম। পিছনে সরিয়ে নিলাম নিজের হাত দুটি, সবার অলক্ষ্যে যাতে কোটটা স্পর্শ করতে পারি। তারপর, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, হঠাৎ মুঠো করে ধরলাম পকেটটা— শক্তমতো কি-একটা ঠেকল। শক্ত এবং চৌকো। জোরে মুঠো করলে দুমড়ে যায়—বই! বই না হয়ে যায় না।

বই!

মনে হতেই বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল—চুরি করতে হবে বইটি।…ঠিক ঠিক যদি হাত সাফাই করতে পার, লুকিয়ে এটাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে নিজের সেলে। তারপর পারবে পড়তে। বই—বই পড়তে! তোমার সেলে বসেও বই পড়বার সৌভাগ্য পাবে। দীর্ঘ চার মাস পরে অর্জন করবে আস্ত একখানা বই পড়বার সৌভাগ্য!

চিন্তার অবকাশ নেই। মতলবটা মনে জাগা মাত্র মারাত্মক বিষের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। কানে বেজে উঠল হাজার মৌমাছির গুঞ্জন, বুক ধরফর করতে লাগল, অবশ হয়ে এল হাত। আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লাম।

আচ্ছন্নতার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়া মাত্র ফের হয়ে উঠলাম তৎপর। আস্তে আস্তে কোটটার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। হাত পিছনে, চোখ প্রহরীর দিকে। পকেট থেকে বইটা বার করছি—বার করছি ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে, প্রহরীর চোখে চোখ রেখে। তারপর—টুক করে, একটুখানি হেঁচকা টান দিয়ে, নিলাম বের করে।

বইটি এখন আমার হাতে, আমার আয়ত্তে।

এইবার হল আতঙ্ক। এতক্ষণ যা ভুলেও ভাবিনি তা ভেবে এবার জাগল ভয়। আর ফেরার পথ নেই!

কিন্তু উপায়? বইটাকে এখন সামলাই কি করে?

শেষ পর্যন্ত উপায় একটা করা গেল বার। যেন ট্রাউজারের বেল্ট ঠিক করছি—এই রকম ভান করে বইটাকে কোমরের পিছনে ট্রাউজারের ভেতরে পাচার করলাম। তারপর আস্তে আস্তে ঠেলে নামিয়ে দিলাম আরো খানিকটা নিচে, সেখান থেকে ঘষড়াতে ঘষড়াতে নিয়ে এলাম দাবনার পাশে—হাঁটবার সময় বাইরে থেকে হাত দিয়ে যাতে চেপে ধরে রাখতে পারি। ট্রাউজারের সঙ্গে দুই হাত সেঁটে হাঁটব—একেবারে মিলিটারী কায়দায়।

কার্যকালে যাতে না ফ্যাসাদ বাধে. এক্ষুনি একবার তালিম দিয়ে নেওয়া দরকার। আলনার কাছ থেকে এক পা এক পা করে তিন পা এগিয়ে এলাম। না, ঠিক আছে। দুদিকে দুই হাত ঝুলিয়ে ট্রাউজার চেপে ধরে হাঁটলে ওটা আর পড়ে যাবে না।

জেরা শুরু হল এরপর।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ আমায় অনেক-বেশি হুঁশিয়ার থাকতে হল। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে বইটাকে সামলে রাখার দিকেও আজ নজর দিতে হচ্ছে—বরং বেশিই দিতে হচ্ছে। কপাল ভালো, এ দফায় জেরার মেয়াদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলনা। এবং, নিরাপদেই বইটি নিয়ে নিজের সেলে ফিরে যেতে পারলাম।

একেবারে নির্বাধায় অবিশ্যি নয়। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বইটা হাত থেকে গেল পিছলে। ভাবুন, কী অবস্থা! তাড়াতাড়ি উবুড় হয়ে পড়লাম—যেন প্রচণ্ড কাশির বেগ এসেছে, দম আটকে আসছে। যাক, কোনমতে ওটাকে তো যথাস্থানে ঠেলে-ঠুলে তুলে এ যাত্রায় পাওয়া গেল উদ্ধার।

বইটি নিয়ে ফেরার সময় আমার মনের অবস্থার কথা কী করে আপনাকে বোঝাব! আবার আমি ওই নরকে, নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছি—এবার কিন্তু একা নয়। আর আমি নিঃসঙ্গ নই। এতদিন পরে মিলেছে এক দোসর।

ভাবছেন, ঘরে ঢুকেই বই নিয়ে বসলাম? গোগ্রাসে গেলার মত হুড়বড় করে শুরু করে দিলাম পড়তে? আজ্ঞে না।

একটি বই পেয়েছি, আমার অধিকারে একটি বই—প্রথমে এই আনন্দটাকে আমি বসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

হাতের কাছে বই, সেদিকে দৃকপাত নেই—শুরু হয়ে গেল দিবাস্বপ্ন রচনা। আচ্ছা, কি ধরনের বই এটা? কি ধরনের বই হলে আমি খুশি হই? যে-ধরনের বই-ই হোক, হে ভগবান, টাইপগুলি যেন একেবারে ক্ষুদে ক্ষুদে—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র—হয়। লাইনগুলি যেন হয় অত্যন্ত ঘন ঘন, গায়ে গায়ে বসানো। একেকটি পৃষ্ঠায় যেন থাকে অনেক অজস্র শব্দ। আর, পাতাগুলি যেন হয় ফিনফিনে পাতলা, সংখ্যায় অগুণতি।

অনেকক্ষণ ধরে যাতে পড়তে পারি—অনেকক্ষণ ধরে, অনেক দিন ধরে!

তারপর, আমি চাই—এটা যেন হালকা ধরনের বই না হয়। এ-বই পড়তে গিয়ে যেন হতে হয় গলদঘর্ম। এ-বই পড়ে যেন কিছু শিখতে পারি, বইটি যেন মনে রাখতে পারি, পারি মুখস্থ করতে। আচ্ছা, এটা যদি গ্যেটের কোন বই হয়? কিম্বা হোমরের?

লোভের লাগাম টেনে রাখা আর গেল না। লোভ এবং কৌতূহল। আত্মসমর্পণ করলাম ওর হাতে। বিছানায় শুয়ে পড়লাম—হুট করে দরজা খুলে ঢুকলে প্রহরীটা যাতে না সন্দেহ করতে পারে। শুয়ে আস্তে আস্তে বের করলাম বইটি। হাত থরথর করে কাঁপছে।

প্রথম দর্শনেই শুধু যে নিদারুণ ভাবে হতাশ হলাম তাই নয়, অকথ্য বিরক্তিতে সারা মন ছেয়ে গেল। অতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যে-সম্পদ আহরণ করে আনলাম, পরাস্বপহরণ করলাম, যাকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করলাম আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসৌধ—সেটা কিনা একটা দাবার বই? দেড়শ চ্যাম্পিয়নশিপ দাবা খেলার ফিরিস্তি মাত্র! দাবা খেলার সংকলন!…এরই জন্যে এত!

সেলে বন্দী না হলে, জানালাটি কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা না থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে বইটাকে আমি ছুঁড়ে দিতাম বাইরে।

ক্ষেপে গেলাম। এই রকম একটা বাজে বই নিয়ে আমি কী করব?

ইশকুলে পড়বার সময়, আর-আর ছেলেদের মত দাবা যে আমিও না খেলেছি তা নয়। কিন্তু সে-খেলা খেলেছি স্রেফ সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে। তবু নিজের হাতে খেলা এক জিনিস, আর বইয়ে সেই খেলার ফিরিস্তি পড়া অন্য জিনিস। দাবার থিয়োরী আমার কোন্ শ্রাদ্ধে লাগবে! একা একা আমি দাবা খেলতে পারিনে। তার ওপর যদি ছক ঘুঁটিটুটি কিছু না থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা!

মনে মনে গজরাতে গজরাতে চটপট পাতা উল্টে যাই, যদি পাঠ্য বস্তু কিছু চোখে পড়ে! যদি একটা ভূমিকা থাকে! অন্তত লিখিত নিয়মাবলী!

বৃথা আশা!

আছে শুধু কতকগুলি শাদা-কালো চৌকো চৌকো ঘর, আর দাবার ঘুঁটি—বড়ে, ঘোড়া—ইত্যাদি আঁকা। অর্থাৎ, পৃথিবীর কয়েকটি সেরা খেলার সচিত্র বিবরণী।

এর কিছুই আমি বুঝিনে। দেখে-শুনে মনে হল, এটা যেন এক ধরনের এ্যালজেব্রা—বীজগণিত। এর সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি নেই হাতে আমার।

অনেক কসরতের পর আমি শুধু এইটুকু বুঝলাম যে, ওপর-নিচের ঘরগুলিকে ক খ গ ইত্যাদি এবং পাশাপাশি ঘরগুলিকে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘুঁটির অবস্থান যাতে সহজেই বুঝতে পারা যায় তাই এ ব্যবস্থা। এটা শুধু জ্যামিতিক ছক কেটে এঁকে দেখানোই চলে, মুখের কথায় বোঝা কিছুই যায় না।

ভাবলাম, এই সেলে বসেই যদি আমি একটা দাবার ছক তৈরী করে ফেলতে পারি—তাহলে হয়ত বই দেখে দেখে খেলাটাকে শেষতক রপ্ত করতে পারব। ভাবছি, ভাবছি, ভাবছি—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজর পড়ল বিছানার চাদরটার দিকে। শাদা-কালোয় ছাপা, যাকে বলে চেক-চাদর, অসংখ্য চৌকো চৌকো ঘর—হুবহু দাবার ছকের মত। ভগবান যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

হিসেব করে ওর থেকে চৌষট্টিটা ঘর আমি বেছে নিলাম—তৈরী হল দাবার ছক। তারপর বইয়ের প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বইটি লুকিয়ে রাখলাম মাতুরের তলায়।

এবার চাই ঘুঁটি। ঘুঁটি ছাড়া দাবা খেলা যায় না। কি করি, আধপেটা খেয়ে সেই রুটির টুকরো দিয়ে রাজা-উজির ইত্যাদি বানালাম (সে হল এক দেখবার মত জিনিস!)। শুধু ঘুঁটি-সমস্যার সমাধান নয়, এই ভাবে পুরোদস্তুর এক প্রস্থ দাবার সরঞ্জাম তৈরী করে ফেললাম।

এরপর বইয়ের ছবি দেখে দেখে সাজালাম ঘুঁটিগুলি।

কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, রুটির ঘুঁটি দিয়ে, 'শাদা'র থেকে তফাৎ করবার জন্যে ষোলটি ঘুঁটি ধুলো মাখিয়ে নেয়া সত্ত্বেও, বইমাফিক খেলা এক দুষ্কর ব্যাপার। প্রথমে দিনকয়েক তো বারবার গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। একই খেলা পাঁচ, দশ, পঁচিশবার পর্যন্ত নতুন করে শুরু করতে হয়, তবু যায় তালগোল পাকিয়ে। হাল তবু ছাড়িনে, আমি বলেই ছাড়িনে—আমার মত এমন অঢেল অপর্যাপ্ত সময়, এমন অর্থহীন অগাধ অবসর

দুনিয়ায় আর কার আছে! সময়ের অপব্যবহার করার এমন ঢালাও অধিকার আর কে পেয়েছে, আমি ছাড়া! নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতার দাসানুদাস আমি, ধৈর্য আমার অতুলনীয়।

আর, অপরিমেয় জীবন-কামনা।

ছদিন একটানা চেষ্টার পর, একবারও ভুল না করে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলাটি খেলতে সক্ষম হলাম। আরও হপ্তাখানেক পরে ঘুঁটিগুলোকে যথাস্থানে বসিয়ে নেবার প্রয়োজন আর রইল না। এবং, এরও দিন সাতেক পরে ছকের, মানে, চাদরেরও না। ছাপার অক্ষরে ছকের ঘুঁটিগুলির অবস্থান দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনের পটে সেটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—চাদরের ছক বা রুটির ঘুঁটির কোন দরকারই তখন আর থাকে না। সেই বিমূর্ত ছক-ঘুঁটিই আমার কাছে তখন প্রতিভাত হয় বাস্তব রূপে।

তবু, প্রথম প্রথম কেমন-যেন ধাঁধা লাগত, তারপর ধীরে ধীরে সেটা মনে গাঁথা হয়ে গেল। চোখ বুজেও সব এখন দেখতে পাই স্পষ্ট। মনের পটে সাজিয়ে নিলাম একটি দাবার ছক, আর বত্রিশটি ঘুঁটি। মনে মনেই চাল দেই, চাল দিয়েই বুঝতে পারি পরে চালটা কি হবে, কি হওয়া উচিত। সঙ্গীত-বিশারদরা যেমন মুদ্রিত স্বরলিপির দিকে একপলক তাকিয়েই সঙ্গীতের শব্দহীন সুরধ্বনি মনের কানে শুনতে পান, আমার অবস্থাও হল অবিকল তেমনি।

দিন পনের পরে বই দেখে মনে মনে খেলতে, দাবার ভাষায় চোখ বুজে খেলতে, কোন অসুবিধে আর রইল না। এবং

এখন, এতদিন পরে, আমি বুঝতে পারলাম—চুরির সাহায্যে কি মহাসম্পদ আহরণ করে এনেছি। সার্থক হয়েছে চুরি আমার। এতদিনে আমি একটি কাজ পেয়েছি। বলতে পারেন, এ কাজ অর্থহীন, কোন মানে হয় না এই কাজের। না হোক মানে, তবু তো কাজ? যে ভয়াবহ শূন্যতা চারদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছিল, এইভাবে তার থেকে আমি মুক্তি অর্জন করেছি। শূন্যতার দমবন্ধ পরিবেশটা এইবার চৌচির। স্থানহীন সময়হীন শূন্যতার একঘেয়েমিকে এবার আমি প্রতিরোধে সমর্থ, ওর মারণাস্ত্র এখন করায়ত্ত আমার।

সেই মারণাস্ত্র হল—একশ পঞ্চাশটি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার ওই সচিত্র বিবরণী।

কিন্তু সব সময় তো খেলা যায় না? দুদিন বাদে এই খেলাও তাহলে পুরনো হয়ে যাবে, ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে। তাই আমি একটা রুটিন করে নিলাম—সকালে দু বাজি, দুপুরে দু বাজি। এবং সন্ধ্যায় সকাল-দুপুরের খেলাগুলির রোমন্থন।

এর ফলে প্রত্যেকটি দিন আমার স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নতুন খেলা নতুন দিন—আরেক দিন। আগে আমার কাছে প্রত্যেকটি দিন ছিল পূর্ব দিনের হুবহু পুনরুক্তি মাত্র—এখন আর সেটা রইল না। প্রত্যেক দিনেই এখন আমার নতুন-কিছু করণীয় থাকে। নিজের মধ্যে কর্তব্যের একটা তাগিদ এখন অনুভব করি। আর, এই কর্তব্যও নীরস নয়। কেননা, দাবা খেলায় একেই তো উত্তেজনার খোরাক পুরো মাত্রায়, তার ওপর এ-খেলা আবার মনে মনে। খেলোয়াড়

হল আমার মত এক মানুষ। বন্দীত্ব অন্তরায় হওয়া দূরে থাক, অনন্যোপায় বন্দী বলেই এ খেলায় উৎসাহ আমার অতুলনীয়।

বই দেখে দেখে খেলতাম বলে প্রথম দিকে খেলাটাকে নেহাৎ যান্ত্রিক বলে মনে হত। কিন্তু ধীরে ধীরে সে-ভাবটা কেটে যেতে লাগল, এক রসিক শিল্পী জেগে উঠল আমার মধ্যে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সূক্ষ্ম কলা-কৌশলগুলি আয়ত্ত করে নিলাম। পরিচিত হলাম চ্যাম্পিয়নদের খেলার নিজস্ব বিশিষ্ট কায়দাকানুনের সঙ্গে।

পরিচিত কোন কবিতার প্রথম লাইন শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাকি লাইনগুলি যেমন মনে পড়ে যায়, তেমনি চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়দের প্রথম চাল দেখেই পরের দু-তিনটি চালের কথা এখন আমি বলে দিতে পারি অনায়াসে। বলে দিতে পারি, এবার ও কোন্ ঘুঁটি কোথায় বসাবে, কোনটা দিয়ে আক্রমণ চালাবে, আত্মরক্ষা করবে কোন্‌টার সাহায্যে।

প্রথমে যা ছিল নিছক সময় কাটানোর উপাদান, তাই এখন হয়ে দাঁড়াল আনন্দের উৎস। এ্যালেকাইন, ল্যাস্কের, বোগুলযোবভ ও তার্তাকোভার—বিশ্বের এই সেরা সেরা দাবাড়েরা হয়ে উঠলেন আমার বন্দী-জীবনের প্রিয়তম মিতা, অন্তরঙ্গ সাথী।

আমার নির্জন সেল পরিণত হল বহুজনের—বহুবিচিত্র অপরিচিত নরনারীর—মিলনতীর্থে। না যাক তাঁদের চোখে দেখা, তবু তাঁরা আছেন, আছেন আমার চারপাশে। আমাকে ঘিরে। চব্বিশঘণ্টা।

নিয়মিত রুটিনমাফিক খেলার ফলে আমার মানসিক ভারসাম্যও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে, ভোঁতা-হয়ে-যাওয়া বুদ্ধিবৃত্তি ফের হয়ে উঠছে ধারালো। পুরনো আমিকে ফিরে পাচ্ছি। সবসময় চিন্তা-ভাবনায় নিয়োজিত থাকার জন্যে মনটাও এখন খুশি থাকে, প্রেরণা পায় নতুন চিন্তার।

জেরার সময় এর প্রমাণ পাওয়া যেত। এর পর আর জেরা-ঘরে পা দিয়েই বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম না—ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে জবাব দিতাম সব সওয়ালের। দাবা খেলতে খেলতে পাকা দাবাড়ে হয়ে উঠছিলাম, মিথ্যে চালে অসার হুমকিতে আর ভুলিনে, হুঁশিয়ার খেলোয়াড়ের মত চাল দিই—জেরার জবাব দিই। আমার সাথে আর ওরা এঁটে উঠতে পারেনা। এমন-কি, শেষের দিকে মনে হত—ওরা এবার আমায় কিছুটা সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করেছে। আমায় দিয়ে কাজ হাসিলের কোন আশা নেই দেখেই এই পরিবর্তন ঘটেছে কিনা কে জানে। কিম্বা, নিজেরাও হয়ত ওরা পড়ে গেছে মহা সমস্যায়। ভাবছে—কি করে আমি এতখানি প্রতিরোধ-শক্তি পেলাম? কোথা থেকে পেলাম? স্রেফ জেরার অস্ত্রে কত শত লোককে ওরা ঘায়েল করেছে, আর আমি কিনা টান্ হয়ে দাঁড়াচ্ছি দিনকে দিন?

প্রায় আড়াই মাস কাটল এইভাবে। সে যে আমার কি আনন্দের দিনগুলি! সম্বল বলতে কিন্তু ওই দেড়শ খেলা।

রোজ নিয়মিত রুটিনমাফিক খেলে যাই, সামনে বইটি মেলে ধরে।

কোথা দিয়ে যে কেটে গেল ওই আড়াই মাস!

তারপর, হঠাৎ দেখা দিল এক প্রবল অন্তরায়—একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। দেখলাম, আবার সেই ভয়ঙ্কর শূন্যতার সম্মুখীন আমি। একেকটি খেলা অনেক বার—অসংখ্যবার খেলে খেলে খেলার নতুনত্ব গেছে নষ্ট হয়ে, উবে গেছে সমস্ত কৌতূহল। থিতিয়ে এসেছে উত্তেজনা। যে-খেলার প্রত্যেকটি চাল আমার নখদর্পণে, কি লাভ তার পুনরুক্তিতে? কী আকর্ষণ সেই খেলায়? মনে মনে খেলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পর পর প্রতিটি চাল আমার মনের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ওঠে। কোন বিস্ময় নেই। কোন উত্তেজনা নেই। কোনরকম সমস্যার বালাই নেই।

এখন আমার প্রয়োজন আরেকটি বইয়ের—যাতে পাওয়া যাবে নতুন নতুন খেলা। নইলে এই অশান্ত মনকে শান্ত করবার কোন উপায় নেই আর। কিন্তু নতুন বই জোগাড় করাও অসম্ভব ব্যাপার, নিছক আকাশকুসুম। অগত্যা আমার রয়েছে একটি মাত্র পথ—পুরনো খেলার পুনরাবৃত্তি আর নয়, আবিষ্কার করতে হবে নতুন নতুন খেলা। নিজেকেই আমার আবিষ্কার করতে হবে। কারো সাহায্যের প্রত্যাশা নেই। খেলতে হবে নিজে নিজে, আপন মনে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি নিজেকেই দাঁড় করানো যায় নিজের প্রতিপক্ষ।

খেলার রাজা দাবা—জানিনে এই দাবা খেলাকে কী চোখে আপনি দেখেন, দাবাড়েদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে কতখানি মর্যাদা দেন। এ-খেলায় রীতিমত মাথা ঘামাতে হয়। আসলে

মাথাই শুধু ঘামাতে হয়—আর কিছু নয়। সেক্ষেত্রে নিজের বিরুদ্ধে নিজে খেলা ন্যায়শাস্ত্রের মাপকাঠিতে যে এক অবাস্তব ব্যাপার—এটুকু বোঝবার জন্যে খুব-বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। দুটি মস্তিষ্কের লড়াই দাবা—প্রতিপক্ষ দুজন শত্রু পরস্পরের। কালো শাদাকে জানেনা, শাদা কালোকে না। নিজ নিজ রণনীতি অনুযায়ী দুটি মস্তিষ্ক লড়াই করছে—কে হারে কে জেতে! কালো কোন্ দিক এগোবে তা না জেনেই শাদা এগোয়। শাদাও তেমনি।

শাদা কালো— দুটি মস্তিষ্ক। পরস্পরের শত্রু দুজন।

এখন কথা হল, একই মানুষ কি দুটি মগজের মালিক হতে পারে? মগজকে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ভাগ করা কি সম্ভব? ব্যাপারটা তাহলে কি রকম দাঁড়ায়? না, শাদার চাল দেবার সময় কালোর কথা মন থেকে সে একেবারে মুছে ফেলবে—একটু আগেই কালো কোন্ চাল দিয়েছে, একটু পরেই বা কোন্ চাল দেবে—কিচ্ছু সে জানে না। জানেনা ইচ্ছে করেই।

জানে, কিন্তু জানেনা।

কালোর বেলায়ও অবিকল এমনি।

ভাবুন, কী মারাত্মক ব্যাপার! শুধু মগজ নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র সত্তাকে পর্যন্ত দু টুকরো করে ফেলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে দুটি বিরোধী ব্যক্তিত্ব। একই শরীরে বহন করতে হবে দুটি মানুষের অস্তিত্ব। স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব।

তার মানে, মস্তিষ্ককে পরিণত করতে হবে বশংবদ যন্ত্রে। আমার খুশিমত আমার প্রয়োজন মাফিক সেই যন্ত্রের একাংশকে

যখন কাজে লাগাব, অপর অংশ থাকবে একেবারে নিষ্ক্রিয়। এ ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, ও কিন্তু তা টেরও পাচ্ছে না।

বলুন, এও কি সম্ভব!

আসলে, নিজের সঙ্গে দাবা খেলা আর লাফ দিয়ে নিজের ছায়াকে পেরিয়ে যাওয়া একই ব্যাপার। অসম্ভব ব্যাপার।

তবু, এই অসম্ভবের সাধনাতেই আমি মগ্ন হলাম। কেননা আমি তখন মরীয়া, অনন্যোপায়। অসম্ভবকে সম্ভব করার দুরূহ তপস্যায় কাটল মাস কয়েক। নইলে সেই ভয়াবহ শূন্যতার নিষ্ঠুর পীড়নে নিশ্চয় আমার মাথা খারাপ হয়ে যেত। তাই চেষ্টা করলাম, নিজের সত্তাকে দু টুকরো করে, শাদা-কালোয় ভাগ করে, যদি অন্তত টিকে থাকা যায়। পরিত্রাণ পাওয়া যায় একেবারে-উন্মাদ-হয়ে-যাওয়ার হাত থেকে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন ডাঃ বি। চোখ বুজে রইলেন মিনিট খানেক। মনে হল, হৃদয়বিদারক এক স্মৃতির ভার পাষাণের মত ওঁর বুকখানিকে চেপে ধরেছে, তার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে প্রাণপণে উনি চেষ্টা করছেন।

মুখের বাঁ দিকের একাংশ আবার তেমনি থরথর করে কেঁপে উঠল। কাঁপতে লাগল। কিন্তু এ-কাঁপন রোধ করার সাধ্য ওঁর নেই। একটুখানি সোজা হয়ে বসে ফের তিনি শুরু করলেন—

যাক, এতক্ষণে ব্যাপারটা আপনাকে মোটামুটি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি আশা করি। তবে এর পরের অবস্থা ঠিকঠিক গুছিয়ে বলতে পারব বলে মনে হয় না। মাপ করবেন, সে-ক্ষমতা আমার নেই। এটা মুখে বলার নয়, অনুভবের ব্যাপার।

বুঝতেই পারছেন, এমতাবস্থায় মানুষের আত্মকর্তৃত্ব লোপ পেয়ে যায়। আত্মকে বাদ দিয়ে, নিজেকে বাতিল করে, মস্তিষ্ক নিয়ে টানা-হেঁচড়ার এই হল অনিবার্য পরিণাম। একই সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মস্তিষ্ক-বিভাজন অসম্ভব।

নিজের সঙ্গে দাবা-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম—কথাটা শুনলেও আশ্চর্য লাগে, না? জানি, এবং জানি বলেই আগেভাগে আপনাকে তা বলে রেখেছি। তবু যদি হাতের সামনে দাবার সাজসরঞ্জাম থাকত, তা হলেও না হয় কথা ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ হিসেবে ওর একটা পৃথক অস্তিত্ব চোখে পড়ত। মনের দিক দিয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলা যেত। সত্যিকারের ছক-ঘুঁটি নিয়ে খেলার সময় খেলতে খেলতে ইচ্ছেমত আপনি চিন্তার রাশ টেনে ধরতে পারেন, একবার এধারে আরেকবার ওধারে বসে প্রতিদ্বন্দ্বীর বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, শাদার চাল

দিতে গিয়ে কালোর অবস্থান, এবং কালোর বেলায় শাদার, লক্ষ্য করতে পারেন। আর তা করলে মনের ওপর এতখানি চাপ পড়ে না।

কিন্তু আমাকে নিজের বিরুদ্ধে, বা নিজের সঙ্গে যাই বলুন, খেলতে হচ্ছে। খেলতে হচ্ছে কাল্পনিক একটা ছককে আশ্রয় করে। ছক কাল্পনিক, বত্রিশটি ঘুঁটিও কাল্পনিক। এবং খেলোয়াড় দুজন আমারই দ্বিধাবিভক্ত সত্তা। চোখের—মনের চোখের—সামনে ছকটি রয়েছে, তার ওপব বত্রিশটি ঘুঁটি। একবার শাদার কথা ভুলে গিয়ে কালোর চাল দিচ্ছি, পরমুহূর্তে কালোর কথা ভুলে গিয়ে শাদার। একই সঙ্গে দুপক্ষের সম্ভাব্য চালগুলির কথা ভাবতে হচ্ছে—ভাবতে হচ্ছে এক পক্ষকে শত্রু ভেবে নিয়ে, ভাবতে হচ্ছে তার অজ্ঞান্তে। তার মানে—

পাগলের প্রলাপ ভাবছেন? ভাবুন, কিন্তু ব্যাপারটা কী ভয়ানক তা-ও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? সত্তাকে শুধু দ্বিধা নয়, প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য চালগুলির কথা আগে থেকে ভাবতে গিয়ে বহুধাবিভক্ত করে তোলা—পাগলামি ছাড়া কী।

পাগলামিই। তবে সেকথা ভেবে আপনার মাথা খারাপ করবার দরকার নেই। দয়া করে যেন মনে করবেন না যে আমি চাই আমার খেলার বিশদ বিবরণ নিয়ে আপনি মাথা ঘামান। যাক—

কল্পনার বিমূর্ত ছকে কাল্পনিক ঘুঁটি নিয়ে এইভাবে খেলবার সময় আমার মস্তিষ্ক দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ব্যক্তিত্বকে

পরস্পর-বিরোধী দুই ভাগে ভাগ করা বিপজ্জনক ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এহো বাহ্য। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার ঘটল এর পরে।

প্রথম দিকে আমি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলাগুলিই খেলতাম বারবার। এতে মনের ওপর তেমন দুঃসহ চাপ পড়ত না। কেননা, এ তো নিছক পুনরাবৃত্তি। বই দেখে খেলাগুলি হুবহু মুখস্ত করেছি, এখন খেলে যাচ্ছি যন্ত্রের মত। লোকে যেমন কবিতা, কি দণ্ডবিধি আইনের ধারা-উপধারা মুখস্ত করে—পরে অনর্গল তা বলে যায়, বিনা আয়াসে। কোন কষ্ট এতে নেই। মুখস্তকরা খেলা খেলতে কষ্ট কোথায়? বরং এ-ও এক ধরনের মানসিক ব্যায়াম, মনের প্রফুল্লতা এতে বাড়ে বই কমেনা।

রোজ খেলতাম চার বাজি—সকালে দুবাজি, দুপুরে দুবাজি। এ-খেলা দৈনন্দিন কর্তব্যের শামিল। তাই বেশ ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় কর্তব্য করে যেতাম। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তো কাজকর্ম কিছু-একটা করতে হতই। অবস্থাটা অ-স্বাভাবিক বলে কাজটাও হয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক—এইযা।

খেলতে খেলতে ভুল হলে, বা পরের চালের কথা মনে না পড়লে, সঙ্গে সঙ্গে বই খুলে দেখে নিলেই হয়। অন্যের লেখায় দাগা বুলনোর মত অন্যের খেলা খেলি আমি, নিজের মন বা ব্যক্তিসত্তার কোন প্রশ্নই ওঠেনা এখানে। এর ফলে আমার বিধ্বস্ত স্নায়ুমণ্ডলী বরং নিরাময় হয়ে উঠতে লাগল। শাদাই জিতুক কি কালোই জয়ী হক—দুই সমান আমার

কাছে। কেননা এই জয়ের গৌরব তো আমার নয়, এ্যালেকাইন বা বোগুলযোবভের প্রাপ্য। আমার সঙ্গে— আমার সত্তা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে—কোনও সম্পর্ক এর নেই। নিছক দর্শক আমি, শুধুই দর্শক। খেলা দেখেই আমি সন্তুষ্ট, তৃপ্ত। কিন্তু—

কিন্তু যে-মুহূর্তে নিজের বিরুদ্ধে খেলা শুরু করলাম, সেই মুহূর্তে নিজেরই অজান্তে আমি চ্যালেঞ্জ করে বসলাম নিজেকে। এটাই হল সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা। আমার বিভক্ত সত্তা— শাদা-আমি আর কালো-আমি—পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এখন অবতীর্ণ। যুযুধান দুই-আমির মধ্যেই দেখা দিল এক প্রবল উচ্চাশা—জয়ী তাকে হতেই হবে। জয়ের নেশায় দুপক্ষই হন্যে হয়ে উঠল। কালোর চাল দিতে দিতে কালো-আমি অধৈর্য কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে শাদার দিকে—কী চাল দেবে ও—তার পরে? এ-পক্ষ বাজে চাল দিলে আনন্দে ও-পক্ষ ডগমগিয়ে ওঠে। নিজের ঘুঁটি মার খেলে দুঃখে মুহ্যমান। আবার—

আবোল-তাবোল বকছি? কথাগুলি শুনতে সত্যিই অর্থহীন। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ এটা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু, ভুলে যাবেন না যে আমাকে স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে উপড়ে এনে চরম অস্বাভাবিকতার মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজেদের পাশব জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে মাসের পর মাস আমায় আটকে রাখা হয়েছিল নির্জন সেলে। আটকে রেখে ওরা চেয়েছিল নিজেদের মতলব

হাসিল করে নিতে। আমার ওপর রাগ ওদের বহু দিনের—এইভাবে চেয়েছিল তার শোধ তুলতে।

আমি কী করে এর প্রতিশোধ নেব? অসহ্য ক্রোধে বুক আমার জ্বলে যায়, পুড়ে খাক হই প্রতিহিংসার আগুনে—কিন্তু শত্রু যে নাগালের বাইরে! তাই আমি তখন নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে শুরু করলাম—এই খেলার মধ্যে দিয়ে, নিজেকে দু ভাগে ভাগ করে। প্রতিশোধের তীব্র কামনায় তখন আমি বেপরোয়া। হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত রইল না। প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে—কিন্তু কার ওপর নেব? নিজের বিভক্ত সত্তাটি ছাড়া হাতের কাছে আর কে আছে আমার?

যতক্ষণ খেলা চলত, হিংস্র নেশায় কেবলি আমি ছটফট করতাম। শুরুর দিকে অবিশ্যি শান্ত ও সংযতই থাকতাম, এ-ঘুঁটির চাল দেখার পর বেশ ভেবেচিন্তে চাল দিতাম ও-ঘুঁটির। কিন্তু খেলা যত এগোত, ধাপে ধাপে চড়ত আমার উত্তেজনা। চেষ্টা করেও নিজেকে তখন স্থির রাখতে পারতাম না। শাদা-আমির চাল দেবার তর সয়না, সঙ্গে সঙ্গে কালো-আমি চাল দিয়ে বসে। উত্তেজনায় সে ফেটে পড়তে চাইছে। কালো-আমি হাত তুলতে না-তুলতে চাল দেয় শাদা-আমি। তারো উত্তেজনা বড় কম না। দুজন দুজনকে চ্যালেঞ্জ করে নেমেছে এক মরণপণ দ্বন্দ্বে। ওকে না হারাতে পারলে এর স্বস্তি নেই, একে না হারালে ওর।

প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই

আমি খেলায় নেমেছিলাম। কতবার খেলেছিলাম আপনাকে বলতে পারব না। আন্দাজী হিসেব দেওয়াও অসম্ভব। হয়ত হাজার বার, হয়ত-বা তারও বেশি। মনে নেই। এক দুর্গ্রহ আমায় ভর করছিল, সন্দেহ-কি। তার হাত থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় আমার ছিল না।

সকাল-সন্ধ্যে আমার শুধু এক চিন্তা: ঘোড়া আর বড়ে, নৌকো আর রাজা—মাৎ আর ঘর-বাঁধা। গজ-ওঠা আর ঘর-বাঁধা, বড়ে আর নৌকো, রাজা আর ঘোড়া—কিস্তি আর মাৎ। আমার সমগ্র সত্তা, আমার সমস্ত চেতনা আবর্তিত হতে লাগল শাদা-কালো একটি ছককে কেন্দ্র করে। খেলার আনন্দ পরিণত হল খেলার নেশায়। খেলার নেশা খেলার বাধ্যতায়। খেলতে আমি বাধ্য, না খেলে আমার উপায় নেই—খেলায় হাত থেকে নেই রেহাই।

যতক্ষণ জেগে থাকি, মনে শুধু ওই এক চিন্তা। ঘুমের ঘোরেও পার নেই—দুঃস্বপ্নের মত এই চিন্তা মনে আমার হানা দিতে থাকে। দাবা—দাবা—দাবা—জীবন-মন দাবাময় হয়ে উঠল। দাবার কথা ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনে। দাবার ছক, দাবার ঘুঁটি, দাবার চাল—আমার পৃথিবীতে এছাড়া আর-কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এমনও হয়েছে—ঘুম ভাঙার পর ঢুলঢুলু চোখে চেয়ে আছি, ঘুমেও ক্লান্তির অবসান হয়নি। কেন হয়নি? কি ব্যাপার? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ঘুমের ঘোরেও খেলতে শুরু করেছিলাম,

অসমাপ্ত রয়ে গেছে সেই খেলা। তাই এ অস্বস্তি—আর অস্বস্তি থেকে এই ক্লান্তি।

স্বপ্নে কোন মানুষের দেখা পেলে সে আর আমার চোখে মানুষ থাকত না—রূপান্তরিত হত গজ, নৌকো, দাবা, বড়ে বা ঘোড়ায়।

এমন-কি, আমায় যখন জেরার জন্যে নিয়ে যাওয়া হত, নিজের দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে তখনো আমি শুধু খেলার কথাই ভাবতাম। ভাবতে বাধ্য হতাম, এ-ভাবনাকে ঝেড়ে ফেলার সাধ্য আমার ছিল না। মনে হয়, শেষের দিকে জেরার সময় যা-তা জবাব দিতে শুরু করেছিলাম, কারণ আমার জবাব শুনে বিচারকরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত ফ্যালফ্যাল করে।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করত, কানও দিতাম না। আমি শুধু প্রতীক্ষা করতাম : কতক্ষণে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফের কখন গিয়ে আমি খেলা শুরু করতে পারব—খেলতে খেলতে ফিরে যেতে পারব নিজের জগতে। এই আশায়, এই অভিশপ্ত নেশায়, অধৈর্য হয়ে উঠতাম, ছটফট করতে থাকতাম। জেরার দিকে হুঁশ থাকত না।

নিজের সেলেও একই অবস্থা। সামান্যতম বাধা পেলেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতাম। মিনিট পনেরো লাগত প্রহরীর ঘর ঝাঁট দিতে, দু মিনিটে আমার খাবার দিয়ে যেতে—কিন্তু এই ক'টি মিনিট সময়ও নষ্ট করতে নারাজ আমি। বিরক্তিতে খালি হাঁসফাস করতাম।

কখনো-কখনো খেলায় এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে খাওয়ার কথা মনেও পড়ত না। সন্ধ্যের দিকে হয়ত খেয়াল হল—দুপুরে আজ খাওয়া হয়নি, থালা ভর্তি খাবার যেমনকে তেমনি পড়ে রয়েছে।

শারীরিক অনুভূতি বলতে ছিল শুধু একটি—পিপাসা। থেকে থেকে কী ভয়ঙ্কর পিপাসাই যে পেত! বোধ হয়, অবিরাম চিন্তা আর নিরবচ্ছিন্ন খেলার পরিণাম এটা। দু চুমুকে শেষ করতাম এক-এক বোতল জল, করেই প্রহরীর দ্বারস্থ হতাম। দ্বিতীয় বোতল শেষ করার মিনিট খানেকের মধ্যে জিব ফের শুকিয়ে যেত, আবার পেত পিপাসা—প্রচণ্ড পিপাসা।

শেষ পর্যন্ত খেলায়—তখন আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে একটানা খেলছি—উত্তেজনার মাত্রা এতখানি বেড়ে গেল যে মুহূর্তের জন্যেও স্থির হয়ে বসতে পারতাম না। সবসময় কোন-না-কোন চালের কথা ভাবতাম, আর পায়চারী করতাম। পায়চারী করতাম, আর ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে পায়চারী করতাম। যত-বেশি ভাবতাম, পায়চারীর দ্রুততা বাড়ত তত। দ্রুততা যত বাড়ত, তত জোরালো হয়ে উঠত ভাবনা। তারপর, সিদ্ধান্ত নেবার সময় যখন এগিয়ে আসত, ঘরের মধ্যে আমি ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছি। জয়ের লালসায় তখন আমি অর্ধোন্মাদ। নিজেকে পরাজিত করার, নিজের ওপর প্রতিশোধ নেবার হিংস্র আকাঙ্ক্ষায় বেপরোয়া। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে, বুকখানা ফেটে পড়তে চাইছে—কেননা আমার এক-আমি যে অন্যের কাছে সব সময়েই হেরে যায়! হেরে এক

জনকে যেতেই হয়। সে পিছিয়ে পড়ে। আরেকজন তখন চাবুক হাঁকিয়ে তাকে বলে এগিয়ে যেতে। এবং, শুনে হয়ত আপনি অবাক হবেন, অসহ্য রাগে নিজেই তখন আমি চেঁচিয়ে উঠতাম—'এ্যাই, তাড়াতাড়ি—ঝটপট চাল দাও' ; কিম্বা, 'ভয় কি, এগিয়ে যাও—কুছ পরোয়া নেই!' আমার একটি সত্তা অন্য জনের সাধ মেটাতে দেরি করলেই আমি তাকে অভয় দিতাম, 'ভয় কি—এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও। ভয় কি!'

আজ বুঝি, মনের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ার দরুনই এই অবস্থা আমার হয়েছিল। কি নামে একে অভিহিত করব ? চিকিৎসা-শাস্ত্রে আজ পর্যন্ত এর কোন নজির পাওয়া যায়নি। দাবা-বিষের প্রতিক্রিয়া ? এ ছাড়া আর কী একে বলতে পারি ?

ওজন কমতে লাগল। সহজে ঘুম আসে না। এলেও থেকে থেকে ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠেও চোখ চাইতে কষ্ট হয়, পাতা দুটি যেন জুড়ে গিয়েছে। মাথাটা ভীষণ ভার-ভার লাগছে। একেকসময় এতবেশি দুর্বল লাগে যে জলের গেলাশটি মুঠো করে ধরেও মুখের কাছে তুলতে পারিনে, হাতটা কাঁপতে থাকে ভয়ানকভাবে। কিন্তু—

কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার সাথে সাথে ঘটে যায় অবস্থার আমূল পরিবর্তন। কী-এক অশরীরীশক্তি যেন আমায় তখন ভর করে। পায়চারী আরম্ভ করে দিই—উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম। পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত।

ধাপে ধাপে চড়তে থাকে উত্তেজনার মাত্রা। মাঝে মাঝে নিজের স্বর, নিজেকে-লক্ষ্য-করা-বলা নিজেরই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ঘা দেয় কানের পর্দায়—'কিস্তি!' 'মাৎ!'

এই বীভৎস, ভয়ঙ্কর, অবর্ণনীয় অবস্থার চরম পরিণাম কি হয়েছিল, বলতে পারব না। শুধু মনে পড়ে, সকালে ঘুম থেকে উঠে একদিন দেখলাম সবকিছু কেমন নতুন নতুন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন ঘটে গিয়েছে একটা পরিবর্তন। বলতে-কি, শরীরটাকে আর বোঝা বলে মনে হচ্ছে না। বেশ আরাম বোধ করছি, মধুর একটা ক্লান্তি জড়িয়ে রয়েছে দুই চোখের পাতায় পাতায়। ক্লান্তির মধ্যে এই মাধুর্যের সন্ধান বহু দিন আমি পাইনি! আয়েশে আর চোখ মেলে চাইতে মন চাইছে না।

মিনিট কয়েক শুয়ে রইলাম চোখ বুজে, শুয়ে শুয়ে এই অভিনব ক্লান্তির উষ্ণমধুর আমেজটুকু উপভোগ করতে লাগলাম। আচ্ছন্নের মত।

হঠাৎ মনে হল, কারা যেন আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে কথা কইছে।

সত্যিকারের মানুষের কণ্ঠস্বর। ফিস ফিস চাপা স্বরে কথা কইছে জীয়ন্ত মানুষ! আমার ঘরে! আমার শিয়রে!

আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, ওই ফিসফিস স্বর শুনে কী উতরোল আনন্দের বন্যা জেগেছিল মনে আমার।

জাগবে না! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—হয়ত-বা পুরো একটি বছর হয়ে গেল—মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর আমি শুনিনি। বিচারকদের কাটাকাটা কথা আর কুৎসিৎ কটুকাটব্য ছাড়া, মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দ শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আমি কতদিন!

একি সত্যি? এ-ও কি সম্ভব? এ যে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার!

না না না, এ সত্যি নয়। এ মায়া! নিছক মায়া—আমার মতিভ্রম!

নিজেকে বললাম, খবর্দার! কিছুতেই যেন চোখ খুলোনা। এ স্বপ্ন। জেগে জেগে তুমি স্বপ্ন দেখছ। চোখ মেলে চাইলেই ধ্বসে পড়বে এই স্বপ্নসৌধ, চুরমার হয়ে যাবে তাসের প্রাসাদ। দেখবে, সেই অভিশপ্ত ঘরে ঠিক তেমনি ভাবে তুমি শুয়ে রয়েছ—তোমার চারপাশে সেই চিরন্তন চেয়ার আর টেবিল, সেই টেবিল আর বেসিন আর শয্যা—সবকিছুই হুবহু অবিকল তেমনি। চেওনা চোখ মেলে, নিজের হাতে ভেঙে দিওনা এই স্বপ্নকে। স্বপ্ন দেখছ তুমি, হে আমি, স্বপ্নই শুধু দেখে যাও।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত জয় হল কৌতূহলের। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে চোখের পাতা খুললাম। চোখ মেলে চাইলাম।

এ কী আশ্চর্য বিস্ময়!

অন্য এক ঘরে আমি শুয়ে। ঘরটি আমার সেলের চেয়ে অনেক বড়, অনেক খোলামেলা। কাঁটাতারের জালভিহীন জানালা দিয়ে অবাধে বাইরের আলো আসছে, গাছগাছালি

চোখে পড়ছে। হাওয়ায় ছুলছে গাছের ডালপালা, সবুজ পাতারা। জানালার ’পরে নেই সেই প্রাচীরটি, যার পাষাণ প্রতিরোধে ঘা খেয়ে খেয়ে চোখছুটি আমার কেবলি প্রতিহত হয়ে আসত। দেওয়ালের রঙ শাদা, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সিলিংও অনেকখানি উঁচুতে, তার রঙও শাদা। শুয়েও আছি এক নতুন বিছানায়। অপরিচিত শয্যায়।

না না, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয় আমার। স্বপ্ন এ হতেই পারেনা—ওই তো আমার পিছনে জীয়ন্ত মানুষের ফিস ফিস স্বর উঠছে।

বিস্ময়ের ধাক্কায় হয়ত আমি চমকে উঠেছিলাম, শরীরে হয়ত-বা তার লক্ষণ-কিছু ফুটে উঠেছিল, নিজেরই অজান্তে—কেননা সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

মৃছু-মন্থর পায়ে একজন এসে সামনে দাঁড়াল—এক নারী। মাথায় শ্বেত শিরোভূষণ। নার্স। সিস্টার।

শিরায় শিরায় বয়ে গেল খুশির স্রোত: নারী! সুদীর্ঘ একটি বছর কোন নারীর মুখ আমি দেখিনি। নারীর সান্নিধ্য লাভ করিনি।

তাকালাম, তাকিয়ে রইলাম। ওই মূর্তিমতী মাধুর্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম নিষ্পলক। বোধ হয়, আবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল এক বুনো, বিস্ময় সস্নেহে সে আমায় শাসন করল, ‘উঁহু, নড়াচড়া মোটে চলবে না।’

নার্সের শরীরী অস্তিত্বের দিকে নজর নেই, আমার

কানে বাজছে ওর কণ্ঠস্বর। একজন মানুষই কি আমার সাথে কথা কইল? পৃথিবীতে তাহলে এমন মানুষ আজো রয়েছে যে আমায় জেরা করল না, আমার ওপর নির্যাতন চালাল না—আমার সাথে স্বাভাবিক ভাবে, মানুষেব সঙ্গে মানুষের মত, কথা বলল? আর, সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে বড বিস্ময়—এই কণ্ঠস্বর স্নেহে-মমতায় বিগলিত এক নারীর!

বুভুক্ষুর মত ব্যাকুল আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। মানুষ যে মানুষের সাথে সহজ সুরে সহজ স্বরে কথা কইতে পারে, এই নরকে আসার পর থেকে তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম—ভুলে যেতে হয়েছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসল। হ্যাঁ, সত্যিই ওর মুখে ফুটে উঠল কোমল হাসির রেখা।

তাহলে, এমন মানুষও পৃথিবীতে রয়েছে মুক্তমনে যে হাসতে জানে, ইচ্ছে করলে হাসতেও পারে!

ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে সে আমায় হুঁশিয়ার করে দিল। তারপর চলে গেল, নিঃশব্দে।

তার আদেশ কিন্তু মানতে আমি পারলাম না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা তখনো সামলে উঠতে পারিনি। উঠে বসবার চেষ্টা করলাম: ওকে ভালো করে দেখতে হবে, দেখতে হবে মানুষের এই আশ্চর্য ব্যতিক্রমটিকে—এই সহৃদয় মানুষটিকে। কিন্তু বসতে গিয়েও বসতে পারলাম না, উঠে বসবার ক্ষমতা নেই। ডান হাতটা নাড়তে গিয়ে দেখি, কী-যেন একটা নতুন নতুন অস্বাভাবিক মত ঠেকছে।

এ কী! এ যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! শাদা পুরু ব্যাণ্ডেজে গোটা হাতখানি মোড়া। প্রথমে কিছুই ঠাওর হল না। তারপর আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে উঠলাম।

এতক্ষণে বুঝতে পারছি, আমি কোথায়। কি করে এখানে এলাম তা-ও যেন পারছি আন্দাজ করতে। ওরা নিশ্চয় আমায় মারধর করেছিল, কিম্বা, আমি নিজেই হয়ত নিজের হাতখানিকে জখম করেছিলাম। তাই এখন হাসপাতালে। হাসপাতালের ঘর এটা।

ডাক্তার এলেন দুপুরে। লোকটি বয়স্ক এবং ভদ্র। আমাদের পরিবারকে তিনি জানতেন। আমার কাকা ছিলেন সম্রাটের পরিবারিক চিকিৎসক। নিজে থেকেই তাঁর প্রসঙ্গ তুলে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভাবে ডাক্তারবাবু কথা বলতে লাগলেন। তিনি যে আমাকে অত্যন্ত ভালো চোখে দেখছেন, হাবভাবে সেটাও বুঝিয়ে দিলেন। কথায় কথায় নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন। সবরকমের প্রশ্ন। বিশেষ করে, তাঁর একটি প্রশ্নে আমি খুবই অবাক হলাম—আমি আঙ্কিক, না, রসায়নবিদ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম যে ওর একটাও আমি নই।

'ভা-রী আশ্চর্য ব্যাপার তো!' তিনি বিড় বিড় করতে লাগলেন, 'অথচ জ্বরের ঘোরে আপনি প্রায়ই ভুল বকতেন—গ-৩, গ-৪, ক-৬, ঙ-৫, জ-২······শুনে আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।'

আমার কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করলাম।

বোকার মত হাসলেন তিনি। 'তেমন গুরুতর কিছু নয়।

স্নায়ুর উত্তেজনার ফলেই', বলতে বলতে থেমে গেলেন, সাবধানে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'বুঝতেই পারছেন—এ-ই স্বাভাবিক। দেখা যাক কি হয়। তারিখটা তেরই মার্চ, তাই না?'

সায় দিলাম।

'এতে অবিশ্যি অবাক হবার কিছু নেই! ওই রকম ব্যবস্থার পরিণামে···তা আপনিই প্রথম নন। যাক, এ-নিয়ে বেশি ভাববেন না।'

তাঁর কথা বলার ধরনে এবং সহানুভূতিসূচক হাসিতে স্বস্তি পেলাম অনেকখানি। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে এখন আমি নিরাপদে স্বর্গে অবস্থান করছি।

আমার কি হয়েছিল, দিনকয়েক পরে ডাক্তার নিজেই বললেন। প্রথমে প্রহরী আমার সেল থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দ শোনে। শুনে ভাবে, কেউ হয়ত আমার ঘরে জোর করে ঢুকে পড়েছে, তার সাথে আমি ঝগড়া করছি। ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখার জন্যে সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি তাড়া করে যাই, পাগলের মত যা-তা বলতে শুরু করি। আমার বক্তব্য ছিল অনেকটা এই ধরনের: 'ওরে ভীরু কাপুরুষ, ওরে ব্যাটা হারামজাদা—আমার চোখের সামনে থেকে তুই কোনদিন দূর হবি কি হবিনা তাই বল্।' গালাগাল দিতে দিতে আমি তার ওপর হিংস্র ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, মুঠো করে ধরলাম তার কণ্ঠনালি। সাহায্যের জন্যে সে আর্তনাদ করে উঠল। ক্রোধে আমি তখন উন্মাদ। ডাক্তারী

পরীক্ষার জন্যে ওরা আমায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আচমকা ওদের হাত এড়িয়ে নিজেকে আমি ছুঁড়ে দিলাম জানালার ওপর।

তারই স্মরণচিহ্ন আমার বাহুতে এখনো রয়ে গেছে—এই দেখুন গভীর ক্ষতের দাগ।

হাসপাতালে প্রথম কদিন জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিলাম। এই জ্বরের হেতু মস্তিষ্কের বিকার। তবে এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার স্বাভাবিক বোধশক্তি এখন ফিরে এসেছে।

ফিসফিস স্বরে ডাক্তার তাঁর কথার উপসংহার টানলেন, 'কিন্তু একথা এখন আমি ওদের জানাব না, তাহলে ফের আপনাকে সেই সেলে নিয়ে গিয়ে পুরবে। আমার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন, যথাসাধ্য আমি করব।'

এই হৃদয়বান ডাক্তার ভদ্রলোক আমার নির্যাতনকারীদের কী বলেছিলেন আমার সম্পর্কে, জানিনে। যাই বলে থাকুন, তিনি যা করতে চেয়েছিলেন করলেন—মুক্তি পেলাম আমি। হয়ত তিনি আমায় নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিম্বা, গেস্টাপোর কাছে আমার দামই হয়ত কমে গিয়েছিল। কেননা হিটলার তখন বোহেমিয়া দখল করেছে, অস্ট্রিয়া নিয়ে তত মাথাব্যথা তখন নেই তার।

পনেরো দিনের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাব—আমাকে শুধু এই মর্মে এক শপথপত্রে স্বাক্ষর দিতে হল। মিলিটারী সার্টিফিকেট, হেলথ সার্টিফিকেট, পুলিশ, ট্যাক্স; পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির তাল সামলাতে এই পনেরো দিন এমন ব্যস্ত

রইলাম যে মুহূর্তের জন্যেও অতীতের কথা ভাববার অবসর মিলল না।

মনে হয়, মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত গোপন এবং অতিহিংসেবী কয়েকটি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই মনের পক্ষে বিভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক কোন চিন্তা প্রশ্রয় সেখানে পায় না—এসব চিন্তা জাগা মাত্র অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়, আপনা থেকেই। কেননা, যতবার আমি কারাবাসের দিনগুলির কথা রোমন্থনের চেষ্টা করেছি, আমার অনুভূতির শিখা যেন সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে নিভে গিয়েছে। অনেক সপ্তাহ পরে আজ, এতদিনে, এই জাহাজে প্রথম, শুধু আমি অতীতের কথা—আমার সেই অন্ধকারার দিনগুলির কথা—এমন ভাবে বলতে পারলাম। বলবার মত শক্তি ও সাহস পেলাম।

আপনার বন্ধুদেব সঙ্গে আমার ব্যবহারের মানেটা এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। বুঝতে পারছেন কেন ওঁদের সঙ্গে মন খুলে আমি মিশতে পারিনি, যথোচিত ভদ্রতা বজায় রাখতে পারিনি।

বেড়াতে বেড়াতে বেখেয়ালে স্মোকিং রুমে গিয়ে পড়েছিলাম, ওখানে যাবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। গিয়ে দেখলাম, দাবা-বোর্ডের চার পাশে আপনারা সবাই বসে। দেখে আকস্মিক বিস্ময়ে আর অপরিসীম আতঙ্কে আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। সত্যিকারের দাবার ছকে, সত্যিকারের ঘুঁটি নিয়ে, রক্তমাংসের জীয়ন্ত মানুষও যে খেলতে পারে—একথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, একেবারেই

ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম যে এই খেলায় অন্তত দুটি প্রতিযোগীর—আলাদা আলাদা দুজন মানুষের—প্রয়োজন হয়। সশরীরে তাদের মুখোমুখি বসতে হয়, আপনাদের মত ওই ভাবে বসে খেলতে হয়।

সত্যি বলতে-কি, যে-খেলা ওঁরা খেলছেন ওই একই খেলা যে আমিও একদিন খেলতাম, খেলতাম নিজেরই বিরুদ্ধে, খেলতাম আমার সেই নির্জন কারাবাসের অসহায় দিনগুলিতে—এটা বুঝে উঠতে বেশ-কিছুটা সময় লাগল। একই খেলা—তবে আমার খেলায় সত্যিকারের ঘুঁটি ছিল না, মনে মনে ওগুলি আমার কল্পনা করে নিতে হত। কী আশ্চর্য, আমি যেমন কল্পনায় কাল্পনিক হাত দিয়ে কাল্পনিক ছকে কাল্পনিক ঘুঁটির চাল দিতাম এঁরাও দিচ্ছেন তেমনি! কিন্তু, এঁদের সব-কিছু প্রত্যক্ষ—হাত, ঘুঁটি, ছক, প্রতিদ্বন্দ্বী। এ যেন সেই জ্যোতির্বিদের বৃত্তান্ত—অনেক কাগজপত্র ঘেঁটে যিনি প্রমাণ করলেন যে আকাশে একটি নতুন গ্রহের আবির্ভাব হয়েছে। আসলে যেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না—আকাশের দিকে তাকালেই গ্রহটি চোখে পড়ে স্পষ্ট।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ছকের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখছি, আমার স্বপ্নের সেই ঘোড়া নৌকো রাজা দাবা আর বড়ে, আমার কল্পনার সেই ছক এখন প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব। শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়—হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়, ধরা যায় মুঠো করে।

খেলাটাকে ভালো করে বোঝবার জন্যে আমার মানস-

কল্পনার সঙ্গে এই বাস্তব ছক-ঘুঁটিগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে কৌতূহলের মাত্রা ক্রমেই চড়তে লাগল—বাস্তবে দুজন রক্তমাংসের খেলোয়াড়ের পরিণাম কি হয় দেখতে হবে, দেখতেই হবে আমায়।······এর পরের ব্যাপারের জন্যে আমি লজ্জিত, সত্যিই দুঃখিত—অভদ্রের মত হঠাৎ আপনাদের খেলায় মাথা গলিয়ে বসলাম। সে-জন্যে আমি মাপ চাইছি।

কিন্তু, কী করব বলুন? আপনার বন্ধুর ভুল চাল দেখে নিজেকে যে আমি আর সামলাতে পারলাম না। মনে হল, ওঁর ভুলটা যেন ছুরি হয়ে আমার বুকে এসে বিঁধল। বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে করে ওঁকে আমি বাধা দিইনি, বাধা না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। অবুঝ শিশুকে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখলে লোকে কি আপনা থেকেই ছুটে গিয়ে ধরে না তাকে? কারো বলার অপেক্ষা রাখে? আপনাদের খেলায় আমিও তেমনি বাধা দিয়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। এটা যে অত্যন্ত অন্যায় এবং অভদ্রতা—সে-খেয়াল হয় পরে।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম যে, এ ব্যাপারে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, আমরা বরং খুশিই হয়েছি। এর জন্যে সবাই আমরা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কালকের খেলাতেও যদি উনি অংশ নেন, তাহলে আমি দ্বিগুণ খুশি হব। এ-কাহিনী শোনার পর ওঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহল এখন অ-নে-ক বেড়ে গেল। অতএব—

আমার কাছ থেকে কিন্তু বেশি-কিছু আশা করবেন না,

ডাঃ বি বললেন, আমার কাছে এটা একটা পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। স্বাভাবিক ভাবে, সত্যিকারের প্রতিযোগীর সঙ্গে সত্যিকারের ছকে সত্যিকারের ঘুঁটি নিয়ে খেলতে আমি পারি কিনা—সেটাই আজ আমার সমস্যা। কারণ, যে শত শত—শত শত কেন হাজার হাজার—খেলা আমি খেলেছি, তা কি দাবার নিয়মমাফিক সত্যিকারের খেলা, না সে-সব নিছক কল্পনা-বিলাস—এ-সন্দেহ আজ আমায় পেয়ে বসেছে। জ্বরের ঘোরে মানুষ ভুল বকে, আমারও কি তেমনি দাবা-জ্বরে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে গিয়েছিল? জানিনে। আচ্ছা, আপনি কি সত্যিই ভাবেন যে ওই চ্যাম্পিয়নের সাথে এঁটে উঠতে আমি পারব? পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়কে পরাজিত করতে আমি সক্ষম? নিশ্চয় তা ভাবেন না, কেমন? আমিও না। তবে প্রচণ্ড একটা কৌতূহল যে আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। আমায় আজ পরখ করে দেখতে হবে—সেই নির্জন সেলে সত্যিই আমি দাবা খেলেছিলাম—মনে মনে, নিজের সঙ্গে? নাকি, আসলে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার? দাবার উন্মাদনায় মত্ত হয়ে উঠেছিলাম? সত্যি-সত্যিই হয়ে গিয়েছিলাম উন্মাদ? এটা আমায় দেখতেই হবে। ব্যস, আর কিছু নয়।

ডিনারের ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল এই সময়। কম করেও ঘণ্টা দুয়েক ধরে আমাদের বৈঠক চলছে। কেননা এতক্ষণ ধরে আমি যা লিখলাম, তার চেয়ে অনেক বিশদভাবে ডাঃ বি

তাঁর কাহিনী বলেছিলেন। আপাততুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও তিনি বাদ দেন নি। যা হোক, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

কিছুদূর গিয়েছি, হঠাৎ দেখি তিনিও পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

আমতা আমতা করে তিনি বলতে লাগলেন, আর···আর একটি কথা। দয়া করে আপনার বন্ধুদের জানাবেন—নইলে পরে হয়ত ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে—দয়া করে আপনার বন্ধুদের জানাবেন যে আমি মাত্র এক বাজি খেলব।···মাত্র একটি বাজি, কিন্তু···বেশি নয়···মাত্র একটি! অতীতের জের আর আমি টানতে চাইনে···শুধু একবার পরীক্ষা করে দেখব। তাই···দ্বিতীয়বার সাধ করে ওই বিপদ ডেকে আনার ইচ্ছে আমার নেই। সাহসও না। সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনে পড়লে··· তা ছাড়া, তাছাড়া ডাক্তারও আমায় স্পষ্ট মানা করে দিয়েছেন, বারবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। কোন বাতিকের হাতে আত্মসমর্পণ করলে আর নিস্তার নেই।···দাবার নেশায়—দাবার বিষে—একবার যে আক্রান্ত হয়েছে, দাবা-ছকের থেকে তার শত হস্ত দূরে থাকা উচিত। নইলে···নইলে···আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন···শুধু একবার একসপেরিমেণ্ট করবার জন্যে আমি খেলতে চাই—নইলে···না···এক বাজির বেশি কক্ষনো নয়।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে—ঠিক তিনটেয়—সবাই আমরা সমবেত হলাম স্মোকিং রুমে।

আমাদের দলে এবার দুটি দর্শক বেড়েছে—এঁরাও মনে-প্রাণে দাবার ভক্ত। দুজনে এই জাহাজেরই অফিসার, খেলা দেখবার জন্যে বিশেষভাবে ছুটি নিয়ে এসেছেন। আগের দিনের মত ঝেণ্টোভিক আজ আর দেরি করেনি, সে-ও এসেছে যথাসময়ে।

যথারীতি কে শাদা আর কে কালো ঘুঁটি নেবে ঠিকঠাক হওয়ার পর শুরু হল খেলা।

ঐতিহাসিক খেলা॥

আপসোসের বিষয়, এই খেলায় গুণাগুণ বর্ণনায় আমি অক্ষম। একেবারেই হাটুড়ে দর্শক আমরা। ও-খেলা যাচাই করার মেকদার আমাদের নেই। গতানুগতিক সঙ্গীতের মাপকাঠিতে যেমন বেঠোভেনের বিচার চলেনা, তেমনি দাবা খেলার তথাকথিত নিয়মকানুন-ফিরিস্তির সঙ্গে এ-খেলার সামঞ্জস্য খোঁজা বৃথা। এমন-কি, পরের দিন বিকেলে সবাই মিলে এক সাথে খেলাটা নিয়ে আলোচনা করেও এর আগাপাশতলা কিছুই আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।

হয়ত তার কারণ—খেলার চেয়ে খেলোয়াড় দুজনের দিকেই তখন আমাদের নজর ছিল বেশি, ওদের নিয়েই আমরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। মানসিক উৎকর্ষের বিচারে দুই প্রতিযোগীর পার্থক্যটা তাদের শরীরিক বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে এমন ভাবে ফুটে বেরাচ্ছিল যে আমরা চোখ ফেরাতে পারিনি, ভালো করে খেলা দেখবার ফুরসৎ পাইনি।

নিয়মকানুনের অন্ধ অনুকারক ঝেণ্টোভিক, চাল দেয় সে আঙ্কিক হিসেবে। শুরু থেকেই নিষ্প্রাণ পুতুলের মত লোকটা বসে আছে, ছকের দিকে নিষ্পলক। ভাবছে, প্রাণপণে ভাবছে। মনে হয়, ভাবতে গিয়ে বেচারাকে শারীরিক কসরৎ করতে হচ্ছে রীতিমত। তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে একযোগে মদত যোগাতে হচ্ছে এজন্যে।

ডাঃ বি আবার ঠিক এর বিপরীত। একেবারে ঢিলেঢালা ভাব, খানিকটা যেন বেপরোয়াও। সদর্থে সত্যিকারের এ্যামেচার খেলোয়াড়ের মত খেলছেন তিনি। খেলায় চৌকোস নিঃসন্দেহে, কিন্তু খেলাটা তাঁর কাছে পেশা নয়, নেশা। খেলছেন নিছক খেলারই আনন্দে। খেলতে খেলতে সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলছেন। চাল দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার তাৎপর্য। একবার হয়ত একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর নিজের পালা এলে ছকের দিকে বড়-জোর মিনিটখানেক তাকিয়েই দিয়ে দিলেন চাল। প্রত্যেকবারই মনে হচ্ছে, তিনি যা আশা করেছিলেন প্রতিপক্ষ ঠিক সেই চালই দিয়েছে।

খেলার গতি বেশ দ্রুত—যন্ত্রের মত দু পক্ষ চাল দিয়ে যাচ্ছে। সপ্তম কি অষ্টম বার চাল দেবার পর খেলা বেশ জমে উঠল বলে মনে হল।

চাল দেবার আগে ঝেণ্টোভিক এখন থেকে বেশি সময় ধরে ভাবতে লাগল। ফলে খেলার গতি পড়ল ঝিমিয়ে। তাই দেখে আমরাও বুঝলাম, এইবার শুরু হয়েছে বাঘের খেলা, এইবার দেখা দিয়েছে হারজিতের প্রশ্ন।

কিন্তু, সত্যি কথা বলতে-কি, খেলার এই মন্থরগতিতে তেমন-কোন উত্তেজনার খোরাক আমরা পাচ্ছিনে। এর কারণ, আগেই বলেছি, নেহাৎই হাটুড়ে দর্শক আমরা—বড় বড প্রতিযোগিতা উপভোগের ক্ষমতা আমাদের নেই। কি মতলব নিয়ে দুজনে চাল দিচ্ছে, মাথামুণ্ডু কী-যে ছাই অত ভাবছে, কোথায়-যে ওদের সুবিধে আর কোথায় অসুবিধে—কিছুই আমরা ঠাওর করে উঠতে পারছিনে। কয়েকটি ঘুঁটিকে অবলীলায় শত্রুর মুখে সঁপে দেওয়া হচ্ছে। আমরা ভাবছি সঁপে দেওয়া হচ্ছে, আসলে কি আর তাই? নিশ্চয় এটা ওদের রণনীতিরই অচ্ছেদ্য অংশ—তা বোঝার বুদ্ধি আমাদের ঘটে নেই।

আমরা ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ক্লান্ত এবং বীতস্পৃহ। এর জন্যে অনেকখানি দায়ী অবিশ্যি ঝেণ্টোভিক। একেকটি চাল দেবার আগে সে এত-বেশি সময় নিচ্ছে ভাবনায় যে, আমাদের বন্ধুও রীতিমত অধীর হয়ে উঠেছেন। অস্বস্তি বোধ করছেন—তাঁর চালচলনে সেটা প্রকট হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম—ঝেণ্টোভিকের চাল দিতে যত দেরি হয়, আমাদের বন্ধুর ছটফটানি তত বেড়ে চলে। চেয়ারে উশখুশ করতে থাকেন, একটার-পর-একটা সিগারেট ধরিয়ে চলেন, বারবার পেন্সিলটা মুঠো করে ধরে কী-সব নোট করেন। মিনিটে মিনিটে হুকুম করছেন জল নিয়ে আসবার জন্যে। একেক চুমুকে শেষ করছেন এক-এক গেলাশ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঝেণ্টোভিকের তুলনায় ওঁর মনের গতি শতগুণ অগ্রগামী। তাই এই অস্বস্তি, এই অধীরতা।

অনেক ভেবেচিন্তে ঝেণ্টোভিক যেই চাল দেবার জন্যে তার স্থূল মাংসল হাত দিয়ে কোন ঘুঁটি ধরে—অমনি হাসি ফুটে ওঠে আমাদের বন্ধুর মুখে। সবজান্তার হাসি—অর্থাৎ, ঝেণ্টোভিক যে এ-চাল দেবে আগে থেকেই তিনি তা জানতেন। ঝেণ্টোভিকের চাল শেষ হওয়া মাত্র তিনিও দেন পাল্টা চাল।

প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য প্রত্যেকটি চাল যেন তাঁর নখদর্পণে। তাই ঝেণ্টোভিকের চাল দিতে দেরি হলে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেন। দুই ঠোঁট সূচালো হয়ে ওঠে, চাপা ক্রোধে যেন গজরাতে থাকেন মনে মনে।

ঝেণ্টোভিকের অবিশ্যি সেজন্যে কোন ভাবান্তর নেই। তাড়াহুড়ো না করে সে খেলতে লাগল—ধীরেসুস্থে, যথারীতি। অনেক ভেবেচিন্তে একেকটি চাল দেয়, সমস্যা যত জটিল

হয়, ভাবে তত বেশিক্ষণ ধরে। এ-ভাবনার কোন বাহ্যিক প্রকাশ নেই—নিষ্প্রাণ পুতুলের মত নিষ্পলক ছকের দিকে চোখ রেখে ভেবে চলে।

বিয়াল্লিশতম চাল দেবার সময়, ঘণ্টা দেড়েক তখন কাবার, আমরা একেবারে এলিয়ে পড়লাম। খেলা সম্পর্কে সমস্ত কৌতূহল আমাদের উবে গেল। জাহাজের যে দুজন অফিসার ছুটি নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের একজন আগেই সরে পড়েছেন, আরেকজন বইয়ে মনোনিবিষ্ট। চাল দেবার সময় শুধু একবার চোখ তুলে তাকাচ্ছেন—ব্যস!

তারপর, হঠাৎ ঘটল সেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। ঘটল ঝেণ্টোভিকের একটি চালকে কেন্দ্র করে।

যে-মুহূর্তে ডাঃ বি দেখলেন যে ঝেণ্টোভিক গজে হাত দিয়েছে, আক্রমণোদ্যত বিড়ালের মত শিকারের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন আর-কি! সমস্ত শরীর তাঁর থরথরিয়ে উঠল। ঝোণ্টোভিক চাল দেওয়ার সাথে সাথে তিনি দাবা এগিয়ে দিয়ে বিজয়ানন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'এইবার! এইবার কোথায় যাবেন!'

সোজা হয়ে উঠেছিলেন, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন, বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রাখলেন দুই হাত, রণং দেহি দৃষ্টিতে তাকালেন ঝেণ্টোভিকের দিকে। ঝকঝক করছে চোখের মণিদুটি।

অগত্যা আমরাও তাকালাম ছকের দিকে। কী এমন

ব্যাপার, যার জন্যে অত কাণ্ড? কেন উনি এমন ঘর-ফাটানো চিৎকার করে উঠলেন?

ছকের দিকে আমরা তাকালাম বটে, কিন্তু ঝেণ্টোভিকের আসন্ন এবং অনিবার্য বিপদের কোন লক্ষণই প্রথমে চোখে পড়ল না।

আমাদের বন্ধু তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, সম্ভাব্য চালগুলির কথা বলে গেলেন এক-এক করে। আমরাও হাঁ করে শুনে গেলাম। অত দূরদৃষ্টি আমাদের মত হাটুড়ে খেলোয়াড়দের থাকার কথা নয়।

আমাদের মধ্যে একমাত্র ঝেণ্টোভিকই দেখলাম নির্বিকার। কোন ভাবান্তর নেই। এমন অপমানজনক উক্তিটি যেন তার কানেও যায়নি, উল্লেখযোগ্য যেন কিছুই ঘটেনি।

প্রত্যেকে আমরা দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছি ছকের দিকে। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। শুধু টেবিলের ওপর ঘড়িটির, চাল দেবার সময় ঠিক রাখবার জন্যে এটা আনা হয়েছে, টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিন মিনিট কেটে গেল…সাত মিনিট… আট মিনিট—ঝেণ্টোভিক স্থির, নিষ্কম্প। কিন্তু আমার মনে হল, ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে, তার স্থূল থ্যাবড়া নাকটা তাই অমন কাঁপতে শুরু করেছে।

এই প্রতীক্ষা, নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় এই প্রতীক্ষা যেন অসহ্য হয়ে উঠল আমাদের বন্ধুর কাছে। চেয়ারটা হড়হড় করে পেছনে ঠেলে দিয়ে আচমকা তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর শুরু

করে দিলেন পায়চারি। প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে দ্রুতভাবে। দ্রুত থেকে দ্রুততর।

সবাই তাঁর দিকে তাকাল অবাক বিস্ময়ে। আমি শুধু অবাক নয়, রীতিমত একটা অস্বস্তিও বোধ করতে লাগলাম। দেখলাম, এতখানি উত্তেজিত হওয়া সত্বেও পায়চারি করছেন তিনি মাপজোখ মত, সঠিক ছন্দ বজায় রেখে—একটুও উনিশ-বিশ হচ্ছে না। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন নিয়ন্ত্রিত করছে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ার হৃৎকম্প উপস্থিত হল আমার—সেই অভিশপ্ত সেলের সেই অন্ধকার দিনগুলিরই কি পুনরাবৃত্তি উনি এখন শুরু করলেন—নিজেরই অজান্তে? নরকবাসের সেই ক'মাস হয়ত এমনি অস্থির উন্মাদনায় ছটফট করে কাটিয়েছেন, খাঁচায়-আটকানো পশুর মত। এইভাবে পায়চারি করতে করতে হয়ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেত দুই হাত, ঠেলে উঠত কাঁধ দুটি—অবিকল এখন যা হয়েছে। এই ভাবেই হয়ত শত শত বার—হাজার হাজার বার—সেই কুঠুরিতে পায়চারি করেছেন, আর চোখ ফুটে উঠেছে এমনি বুনো বিভ্রান্তিকর দৃষ্টি, এমনি আগ্নেয় চাউনি। তবু—

তবু যেন মনের ওপর এখনো রয়েছে পুরোপুরি কর্তৃত্ব। কেননা, থেকে থেকে ছকের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছেন, ঝেণ্টোভিক চাল দিল কিনা দেখে নিচ্ছেন।

ঝেণ্টোভিক কিন্তু চাল দিচ্ছেনা। চুপচাপ বসে রয়েছে।

ভাবছে। ওদিকে সময় চলে যাচ্ছে…ন মিনিট…দশ মিনিট…।

এরপর যা ঘটল কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ঝেণ্টোভিকের গোদা হাতখানি অসহায়ের মত নেতিয়ে ছিল টেবিলের একপাশে, আস্তে আস্তে হাতখানা সে তুলতে লাগল।

দুই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

ঝেণ্টোভিক কোন ঘুঁটিতে হাত ছোঁয়াল না, তার বদলে হাতের চেটো দিয়ে আস্তে আস্তে ঠেলে ছকের সব ঘুঁটিগুলি দিল একাকার করে। বেশ ভেবেচিন্তেই দিল যেন।

কিছুক্ষণের জন্যে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম: খেলাটি ও ভণ্ডুল করে দিল? পাছে আমরা ওর পরাজয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হই—তাই কি ও এ-কাজ করল? তাই কি? তাই কি!

হাঁ, তাই। অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর যে সেরা দাবাড়ে, অসংখ্য প্রতিযোগিতায় যে অর্জন করেছে জয়ের গৌরব—সেই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়কে আজ হার মানতে হল এমন-এক নাম-না-জানা মানুষের কাছে কুড়ি-পঁচিশ বছর যিনি দাবার ছক ছুঁয়েও দেখেননি। আমাদের ওই বন্ধু, নামগোত্রহীন নগণ্য ওই বন্ধু আমাদের সম্মুখ সমরে মাৎ করলেন পৃথিবীর সেরা দাবাড়েকে আজ।

উত্তেজনার মাথায় আপনা থেকেই চটপট সবাই উঠে দাঁড়াল। কিছু-একটা বলা প্রয়োজন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার জন্যে, অপ্রত্যাশিত এই আনন্দের জন্যে, যাহোক-কিছু করা দরকার।

একজন শুধু বসে রইল পাথরের মূর্তির মত : ঝেণ্টোভিক। সে মাথা তুলল বেশ-কিছুক্ষণ পর। আমাদের বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ স্বরে বলল, আরেক বাজি হবে নাকি ?

নিশ্চয়। ডাঃ বি অতিশয় উৎসাহিত।

তাঁর এই অতি-উৎসাহ আমার কিন্তু ভালো লাগল না। তবে, তিনি যে শুধু এক বাজি খেলার কথাই আমাকে বলেছিলেন, সেকথা এখন মনে করিয়ে দেবার সুযোগ পেলাম না। আমি কিছু বলার আগেই ফের এসে তিনি বসে পড়েছেন, ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছেন। জ্বরো রুগীর মত থরথর করে কাঁপছে তাঁর হাত। কাঁপছে অধীর উত্তেজনায়, উন্মাদনায়। এতবেশি কাঁপছে যে বড়েটা দু-দুবার হাত ফস্কে নিচে পড়ে গেল।

তাঁর এই অস্বাভাবিক চালচলনে প্রথমে আমি কেমন-একটা বেদনা বোধ করলাম, পরে তা পরিণত হল আতঙ্কে। সেই শান্তশিষ্ট ভদ্র মানুষটিকে একি বুনো বর্বরতায় পেয়ে বসেছে! চোখ-মুখের ধরন একেবারে বদলে গেছে, মুখের একাংশ থেকে-থেকে থরথরিয়ে উঠছে, কাঁপছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। প্রবল জ্বরে যেন আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

না না, দোহাই আপনার! আর খেলবেন না। চাপা স্বরে আমি বললাম, আজ আর নয়। একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট। একটার বেশি আপনার সহ্য হবে না।

সহ্য হবে না ? হাঃ হাঃ হাঃ! সশব্দে তিনি হেসে

উঠলেন। তাকালেন তির্যক চোখে, আর একটা কি বলছেন! উনি যতক্ষণ ধরে খেললেন অতক্ষণে অমন বিশ বাজি আমি খেলতে পরতাম, বুঝলেন। মুশকিল কি জানেন, খেলতে খেলতে হাঁ করে বসে থাকতেই আমার বড় কষ্ট হয়।···কি মশাই, চাল দেবেন, না দেবেন না?

শেষের কথাগুলি বললেন ঝেণ্টোভিককে উদ্দেশ করে। স্বরে সৌজন্যের নামগন্ধ নেই, ভঙ্গিটাও ভদ্রোচিত নয়।

নিস্পৃহ এবং শান্ত-কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ঝেণ্টোভিক। সে-দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে দুরন্ত আক্রোশ। দুরন্ত আক্রোশ আর অকথ্য ঘৃণা।

এখন আর এরা দুজনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই খেলোয়াড় মাত্র নয়, শত্রু। পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্যে মরীয়া এখন দুজনেই।

প্রথম চাল ঝেণ্টোভিকের। চাল দেবার আগে সে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে।

বেশ বুঝলাম যে, ইচ্ছে করেই সে এমন দেরি করছে। অতিশয় ঘড়েল লোক, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস না করেও টের পেয়ে গেছে যে, চাল দিতে দেরি হলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অধৈর্য হয়ে ওঠে, বিরক্ত হয়, তালমাত্রা হারিয়ে ফেলে।

স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে প্রতি চালে ঝেণ্টোভিক চার মিনিট করে বেশি সময় নিতে লাগল। সব চেয়ে সহজ যে প্রথম চালটা—রাজার বড়েকে দুঘর এগিয়ে দেওয়া—এতেও তার সময় লাগল পাক্কা চারটি মিনিট। তার চালের সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের বন্ধুও রাজার বড়েকে এগিয়ে দিলেন ত্বঘর। কিন্তু ঝেণ্টোভিক ফের বসে রইল গুম হয়ে—ভাবতে লাগল চুপচাপ। ভেবেই চলল। এ যেন বিদ্যুৎ-চমক দেখার পর ত্বরুত্বরু বুকে বজ্রপাতের প্রতীক্ষা—ব্যর্থ প্রতীক্ষা, বজ্রপাতের কোন সম্ভাবনাই যেখানে নেই।

মুহূর্তের জন্যেও ঝেণ্টোভিক উত্তেজিত হয় না। ধীর, স্থির, অচঞ্চল সে। ভাবছে, বড়-বেশি সময় নিয়ে ভাবছে। বুঝতে পারছি, এই ভাবনার পিছনে রয়েছে তীব্র বিদ্বেষ। বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই আশ্রয় নিয়েছে ভাবনার। এবং, এর ফলে ডাঃ বি-কে ভালো করে লক্ষ্য করবার সুযোগ আমি পেলাম।

তৃতীয় গেলাশ জল তিনি এইমাত্র শেষ করলেন। আর তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল, সেলে থাকবার সময়েও তো এই রকম পিপাসায়—এই রকম দুঃসহ দুর্বার পিপাসায় উনি উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। সেকথা আমাকে কালই বলেছেন। অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রতিটি লক্ষণ ওঁর মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে: কপালে জমছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, হাতের সেই ক্ষতচিহ্নটা এখন আরো-বেশি লাল দেখাচ্ছে, দগদগিয়ে উঠেছে যেন। তবু এখনো নিজেকে উনি সংযত রেখেছেন। এখনো রাখতে পেরেছেন।

কিন্তু চতুর্থ বারের বার ঝেণ্টোভিক তেমনি ভাবে ফের ভাবনা শুরু করা মাত্র উনি সংযম হারিয়ে ফেললেন, ফেটে পড়লেন বোমার মত, হ্যাঁ মশাই, আপনার কি চাল দেবার মতলব নেই নাকি?

মুখ তুলল ঝেন্টোভিক, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল।

যতদূর মনে পড়ে, নীরস স্বরে বলল, যতদূর মনে পড়ে প্রতি চালের জন্যে দশ মিনিট পর্যন্ত সময় দিতে আমরা রাজি হয়েছিলাম—তাই না? ওর কমে চাল দেয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন ডাঃ বি। আর যেন নিজেকে সামলাতে পারছেন না। টেবিলের নিচে তাঁর পা দুটি ছটফট করছে। একবার গোড়ালি তুলছেন, আবার নামাচ্ছেন। কোন প্রেতাত্মা যেন ভর করছে ওঁর ওপর।

আর তাই দেখে সম্ভাব্য এক দুর্দৈবের আশঙ্কায় আমিও হয়ে পড়লাম ভয়ানক নার্ভাস, আতঙ্কে মন আমার ছেয়ে গেল।

প্রতীক্ষার সময় যত বাড়ছে, ডাঃ বি-ও আত্মসংযম তত-বেশি করে হারিয়ে ফেলছেন। শেষপর্যন্ত নিজের উত্তেজনাকে তিনি আর চেপে রাখতে পারলেন না। চেয়ারে বসেই ছটফট করতে লাগলেন, আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগলেন টেবিলে। সশব্দে।

ফের ঝোণ্টোভিক তার চাষাড়ে মুখখানা তুলল, ও-ভাবে ঠকঠক না করবার জন্যে কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি? ওতে আমার ডিস্টার্ব হয়। ও-রকম করলে আমি খেলতে পারি না।

হেঃ হেঃ হেঃ! ডাঃ বি হেসে উঠলেন, খেলতে যে সত্যিই পারেন না সবাই তা স্বচক্ষে দেখছে।

চোখমুখ লাল হয়ে গেল ঝেণ্টোভিকের।

তার মানে? কী আপনি বলতে চান?

ডাঃ বি ফের মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন, কিচ্ছু বলতে চাইনে। তবে—মশায় যে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তা তো দেখাই যাচ্ছে।

কোন কথা না বলে ঝেণ্টোভিক মুখ নিচু করল। চাল দিল সাত মিনিট পার করে।

খেলার তখন একেবারে চরম অবস্থা। প্রতিপক্ষের তুলনায় ঝেণ্টোভিক অনেক শান্ত, সংযত। শেষের দিকে চাল দেবার আগে যতদূর সম্ভব সে দেরি করতে লাগল।

আর এদিকে আমাদের বন্ধুর ভাবভঙ্গিও ধাপে ধাপে ছাড়িয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকতার মাত্রা। মনে হল, এই খেলা সম্পর্কে আর-কোন উৎসাহই তাঁর নেই, অন্য-কিছু-একটা নিয়ে তন্ময় তিনি। বন্ধ হয়ে গেল তাঁর ছটফটানি, ছবির মত বসে রইলেন চেয়ারে। শূন্য দৃষ্টিতে, শূন্য-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে, প্রায়-উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন—অপলক। একটানা বিড়বিড় করে কী-যে বলছেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত চলে গেছেন অন্য-কোন জগতে। কিম্বা—ভেতরে ভেতরে আমারও এই সন্দেহ—কিম্বা অন্য-সব খেলার মহড়া দিচ্ছেন মনে মনে। আবার ঝেণ্টোভিকের চাল দেবার সময় হলেই দেখছি সচেতন হয়ে উঠছেন। দুয়েক মিনিটের মধ্যেই সামলে নিচ্ছেন।

আমার দৃঢ় ধারনা হল যে, ঝেণ্টোভিকের কথা সত্যিই উনি এখন ভুলে গিয়েছেন একেবারে, সেই. সঙ্গে আমাদের সকলের উপস্থিতিও। এখন উনি বদ্ধ উন্মাদ। এখনো অবিশ্যি

তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেনি, এখনো সংযত রয়েছেন, কিন্তু যে-কোন-মুহূর্তে ঘটতে পারে বিস্ফোরণ।

আর সেই সংকট দেখাও দিল—আঠারো চালের পর।

ঝেণ্টোভিক চাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বি ছকের দিকে ভালো করে না তাকিয়েই হঠাৎ গজকে তিন ঘর এগিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, কিস্তি! এবার? সামলান দেখি এই কিস্তি!

সবাই আমরা চমকে গেলাম।

কি-হয় কি-হয়—অপ্রত্যাশিত কোন চালের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে সবাই ছকের দিকে।

তারপর, মিনিট খানেক পরে, সত্যিই ঘটল অঘটন।

আস্তে আস্তে মাথা তুলল ঝেণ্টোভিক, এক-এক করে সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল—এই প্রথম। যে কারণেই হোক ও খুশি হয়ে উঠেছে, খোরাক পেয়েছে খুশি হবার। এই খুশির আনন্দে একটু একটু করে ওর ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেল, ফুটে উঠল বিদ্রূপতিক্ত বাঁকা হাসির আভাষ।

নিজের জয় সম্পর্কে, আমরা এখনো বুঝতে না পারলেও, একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে সে আমাদের সবাইকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গের স্বরে বলল, বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে কিস্তির কোন লক্ষণ আমি অন্তত দেখছিনা।

প্রথমে ছকের দিকে, তারপর কিছুটা থতমত খেয়ে ডাঃ বি-র দিকে তাকালাম আমরা। সত্যি, কিস্তি তো পড়েনি।

গজের মুখে বড়ের চাপ রয়েছে—একটা শিশুও এটা বুঝতে পারে।

পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। তবে কি আমাদের বন্ধু উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে গিয়ে চাল ভুল করে বসলেন ?

এতক্ষণে ডাঃ বি-র নজর পড়ল আমাদের দিকে। আমাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনিও ছকের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

অ্যাঁঃ! একি! একি! রাজার তো ও-ঘরে থাকার কথা নয়! ভুল···আপনার চালে ভুল হয়েছে···নিশ্চয় সব ঘুঁটি ওলট-পালট হয়ে গেছে। বড়ের তো আরো-এক ঘর পিছিয়ে থাকার কথা।···অ্যাঁ···কী সর্বনাশ—এ যে অন্য-একটা খেলা—এ-খেলা তো আমরা খেলছিলাম না। বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। শক্ত ভাবে আমি এখন তাঁর একটি হাত চেপে ধরেছি, হয়ত এত জোরে চেপে ধরেছি যে ওই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যেও সেটা তিনি টের পেয়েছেন।

আমার দিকে ফিরে তাকালেন ডাঃ বি। নিশিতে-পাওয়া লোকের মত বলে উঠলেন, কী ? আপনি আবার কী চান ?

মনে আছে ? শুধু এই কথাটি বলে তাঁর হাতের ক্ষত চিহ্নটার উপর আমি আঙুল দিয়ে চাপ দিলাম। যন্ত্রের মত তাঁর দুই চোখ আমার চালচলন অনুসরণ করে সেই ক্ষত-চিহ্নটার ওপর গিয়ে পড়ল।

আর, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তাঁর কাঁপন, থরথর করে কাঁপতে লাগল সর্বশরীর।

স-র্ব-না-শ! মুহূর্তে মুখখানি তাঁর বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিসফিস করে বললেন, আমি কি বেখাপ্পা কিছু করে বসেছি, অ্যাঁ? আমি কি আহাম্মকের মত কোন কথা বলেছি? তবে কি আমি আবার···তবে কি আমি আবার···!

না। মৃদু স্বরে আমি বললাম, কিন্তু খেলা আপনাকে এক্ষুনি—এই মুহূর্তে—বন্ধ করতে হবে। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। ডাক্তারবাবু কি বলেছিলেন মনে করুন!

ডাঃ বি দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়ালেন।

বেকুবের মত যে ভুল আমি করেছি তার জন্যে করজোড়ে মাপ চাইছি, স্বভাবসুলভ ভদ্রবিনীত ভঙ্গিতে ঝেণ্টোভিককে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, আমি যা বলেছি, তা একেবারেই অর্থহীন। এ-খেলায় আপনিই জিতেছেন। তারপর আমাদেব উদ্দেশ করে: আপনাদের সকলের কাছেও আমি মার্জনা চাইছি। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছিলাম বেশি-কিছু আমার কাছ থেকে আশা করবেন না। এ-পরাজয়ের জন্যে আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন—আর কখনো আমি দাবার ফাঁদে পা দেব না।···এই শেষ!

এই বলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি বিদায় নিলেন। যেমনি রহস্যময় ভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বিদায়ও নিলেন তেমনি রহস্যময় ভাবে।

আমি জানি, কেন এই ভদ্রলোক জীবনে আর কোনদিন দাবার ঘুঁটি স্পর্শও করবেন না, দাবার ফাঁদে পা দেবেন না—শুধু আমি একা জানি। কিন্তু বাকি সবাই বিমূঢ় হয়ে গেছে, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হয়ত ভাবছে একটুর জন্যে বিপজ্জনক একটা পরিণামের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। কী-ভাগ্যি! কিন্তু কী-যে সেই পরিণাম, কেন যে বিপজ্জনক—কেউ জানে না।

আস্ত একটা উজবুক! হতাশায় ফেটে পড়ল ম্যাকাইভার।

সকলের শেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঝেণ্টোভিক। অসমাপ্ত খেলাটার দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে উদার ভাবে বলল, আপসোস! তবে হ্যাঁ, আক্রমণের প্ল্যানটা মন্দ ছিলনা। এ্যামেচার হিশেবে ভদ্রলোকের প্রতিভা আছে মানতেই হবে।

———